নির্ম্মোক

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

ডি, এম, লাইব্রেরী
৭১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বনামধন্য গল্পলেখক

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

নির্মোক

প্রথম পরিচ্ছেদ

যেদিন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলাম সেদিনকার কথাটা এখনও আমার আবছা-ভাবে মনে আছে। মনে হইয়াছিল কি অদ্ভুত কৃতিত্বই না অর্জ্জন করিলাম, একটা দুর্জ্জয় দুর্গ যেন জয় করিয়া ফেলিয়াছি! আমাদের কালে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হওয়াটা খুব সহজসাধ্য ছিল না, দুর্ভেদ্য দুর্গজয়ের মতই কঠিন ব্যাপার ছিল। যদিও মনে মনে জানিতাম যে এই দুর্গজয় ব্যাপারে আমার বীরত্ব অপেক্ষা আমার পিতৃ-বন্ধু কর্ণেল— এর পৃষ্ঠপোষকতাটাই সমধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল, তথাপি কিন্তু আনন্দটা কিছু কম হয় নাই। আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র—এ যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার! জাঁদরেল কর্ণেলের জোরালো সুপারিশ-সত্ত্বেও কিন্তু খানিকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। কর্ণেল সাহেব বলিয়াছিলেন যে পত্রটি লইয়া আমি যেন স্বয়ং বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। বড়সাহেবই ভর্ত্তি করিবার মালিক। পিতামাতার পদধূলি এবং দেবতার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া কম্পিত বক্ষে বড়সাহেবের আপিসের দ্বারস্থ হইলাম। দ্বারে কিন্তু দারোয়ান ছিল। পেটি পাগড়ি লাগানো বেশ কায়দা-দুরস্ত দারোয়ান, অগ্রাহ্য করা চলে না। তাহাকে বলিলাম যে আমি বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। সে বারকয়েক আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল যে, সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন অপেক্ষা করিতে হইবে। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সময় কিন্তু কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, দেখিতে দেখিতে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পা ব্যথা করিতে লাগিল এবং

অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ বেঞ্চিটাতে সসঙ্কোচে উপবেশন করিলাম। শহুরে ছেলে হইলে আমার হয়ত এ সঙ্কোচটুকু হইত না, কিন্তু আমি পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছিলাম, কোথায় কি প্রকার আচরণ শোভানীয় হইবে ঠিক জানা ছিল না। কাঠের বেঞ্চিটাতে বসিলে হয়ত বে-আইনী কিছু হইবে, এই ভয় ছিল। দারোয়ান কিন্তু কিছু বলিল না, বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইত বলা যায় না, এমন সময় হঠাৎ অনাদিবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অনাদিবাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত লোক, এক কালে আমাদের পরিবারের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—আরে, তুমি হঠাৎ এখানে যে?

উঠিয়া গিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনিও বারকয়েক আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিলেন ও বলিলেন—এস আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ী কাছেই।

—আমাকে যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—সেই জন্যেই তো বলছি এস আমার সঙ্গে, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

ভাবিলাম হয়ত অনাদিবাবুর সঙ্গে আপিসের কাহারও আলাপ আছে এবং তিনিও হয়ত একটি সুপারিশ-পত্র দিবেন। তাঁহাব অনুগমন করিলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—উঠেছ কোথায়?

—একটা হোটেলে।

হোটেলের নাম ঠিকানা বলিলাম।

—আমাদেব বাড়ী উঠলেই পারতে!

—আপনি যে এখানে আছেন তা জানতাম না।

আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া অনাদিবাবু বলিলেন—তুমি এই বেশে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাচ্ছিলে, মাথা খারাপ না কি

তোমার ! এই আধ-ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর তালি-লাগান জুতো —মাই গড্‌ !

অত্যন্ত দমিয়া গেলাম।

অনাদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—ভাগ্যিস আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল, তা না হ'লে হয়েছিল আর কি—! এস এই গলিটার ভেতর—

গলির ভিতর ঢুকিয়া অনাদিবাবুর বাসায় উপনীত হইলাম।

অনাদিবাবু প্রথমেই বাড়ীতে ঢুকিয়া চাকরকে একটা নাপিত ডাকিতে বলিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার বৈঠকখানা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোকের রুচি যে বেশ সুমার্জ্জিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঘরখানি ছোট কিন্তু চমৎকার সাজান। প্রতিটি জিনিসে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। টেবিলের উপরে কাগজচাপা দিবার ছোট প্রস্তরখণ্ডটি, দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানি, কোণের শেল্‌ফে চমৎকার করিয়া বাঁধান বইগুলি, তাকের উপর ছোট টাইমপিসটি—সমস্তই সুন্দর।

এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া অনাদিবাবু প্রবেশ করিলেন। যদিও এখন ঠিক চা খাবার সময় নয়, তবু তৈরি হচ্ছিল যখন—। মৃদু হাসিয়া তিনি চায়ের পেয়ালাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—চা-টা খেয়ে তুমি মাথার চুলগুলো কেটে ফেল দিকি আগে ! ওই যে নাপিতও এসে গেছে ! ওরে, বাবুর চুলটা বেশ ভাল ক'রে কেটে দে দিকি, বেশ দশ-আনা ছ-আনা করে ! নাও, চা-টা খেয়ে নাও তুমি—

বাল্যকাল হইতে যে আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলাম, সে আবহাওয়ায় দশ-আনা-ছ-আনা চুলকাটা চলিত না। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে দশ-

আনা-ছ-আনা চুলকাটা লোককে মেথর কিংবা গাড়োয়ান পর্য্যায়ে ফেলিতাম। অনাদিবাবুর কথায় সুতরাং একটু বিচলিত হইলাম। হঠাৎ চুল কাটিবার প্রস্তাবে বিস্মিতও কম হই নাই। আমার মুখ-ভাবে অনাদিবাবু মনের কথাটা বুঝিতে পারিলেন বোধ হয়, বলিলেন—অমন নোংরা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে কোট-প্যাণ্ট আছে?

—না।

—আচ্ছা, আমি সে-সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। অনিলের স্যুটটা তোমার গায়ে ফিট করবে হয়ত—দেখি।

আবার তিনি ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি চা পান করিয়া দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ভাবিতেছিলাম ঐ টেড়িকাটা টিনের বাক্স-হাতে ছোকরা নাপিতটার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব কি না, এমন সময় অনাদিবাবু একটি পত্র হস্তে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এই দেখ তোমার বাবারও চিঠি এসেছে।

দেখলাম বাবা লিখিতেছেন যে, অনাদিবাবু যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমি মফস্বলের কলেজ হইতে পাস করিয়াছি, বড় শহর সম্বন্ধে আমার তেমন ধারণা নাই। ছুটি পাইলে তিনি নিজেই সঙ্গে আসিতেন, কিন্তু কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না, এদিকে ভর্ত্তি হওয়ার শেষ দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে, সেজন্য একাই পাঠাইতে হইল। অনাদিবাবু যে এখানে আছেন তাহা বাবা জানিতেন না, জানিলে আমার সঙ্গেই তিনি পত্র দিয়া অনাদিবাবুর শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিতেন। নরেনবাবুর

মুখে অনাদিবাবুর খবর পাইয়া এই পত্র লিখিতেছেন। অনাদিবাবু যেন—ইত্যাদি।

অনাদিবাবু বলিলেন—চুলটা কেটে ফেল, দেরি ক'রো না—

উঠিয়া গিয়া নাপিতের হস্তে মুণ্ডটি বাড়াইয়া দিলাম।

অনাদিবাবুর ভাই অনিলবাবুর স্যুটটা আমাকে ঠিক ফিট করে নাই। অপরের জন্য যাহা প্রস্তুত তাহা আমাকে ঠিক ফিট করিবেই বা কেন, জামাটা একটু ঢিলা এবং প্যাণ্টালুনটা একটু আঁট হইল। অনাদিবাবু তাহাতে কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। আমার কলার এবং 'টাই'টা স্বহস্তে বাঁধিয়া দিয়া, একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এবং সোৎসাহে বলিলেন—বাঃ চমৎকার হয়েছে—ফেমাস্!

সবচেয়ে মুশকিল হইল জুতা লইয়া। অনাদিবাবুর আগ্রহাতিশয্যে অনিলবাবুর জুতাজোড়াতেই পা ঢুকাইতে হইল।

—ফস্ ফস্ করছে না কি?

ঠিক উলটা—ভয়ানক আঁট হইয়াছে—তাহাই বলিলাম। অনাদিবাবু বলিলেন—ফিতেগুলো একটু আলগা ক'রে দাও, হাঁটতে যদি লাগে একটা গাড়ী ক'রেই যাই না হয় চল, পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার, দেখাটা হয়ে গেলেই সব চুকে গেল!

সত্য সত্যই গাড়ী করিয়া যাইতে হইল। অত আঁট জুতা পায়ে দিয়া, বেশী দূর হাঁটা সম্ভবপর ছিল না। স্যুটের সঙ্গে আমার তালি-দেওয়া, জুতা পরিয়া যাওয়া আরও অসম্ভব ছিল। সুতরাং গাড়ীই একটা ডাকিতে হইল।

আপিসে গিয়া শুনিলাম, সাহেব টিফিন খাইতেছেন, আধ ঘণ্টা পরে দেখা হইবে। অনাদিবাবু চাপরাসীকে আড়ালে ডাকিয়া প্রায়

প্রকাশ্য ভাবেই একটা টাকা বকশিশ দিলেন এবং সাহেবের সহিত দেখা হইয়া গেলে আর এক টাকা দিবেন আশ্বাস দিলেন।

দেখা হইয়া গেল। বড়সাহেব তাঁহার বাল্যবন্ধু কর্ণেল —এর চিঠিখানি পড়িয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে, আমি দরখাস্ত করিয়াছি কি না! বলিলাম—করিয়াছি।

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। হেড ক্লার্ক সসম্ভ্রমে আসিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব হুকুম করিলেন যে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য যতগুলি দরখাস্ত আসিয়াছে আনিয়া হাজির কর। হেড ক্লার্ক চকিতে একবার আমার দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই এক বোঝা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, তোমার দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির কর। দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং সভয়ে লক্ষ্য করিলাম যে, আমার কলেজের প্রিন্সিপাল (অর্থাৎ যে কলেজ হইতে আমি আই. এসসি. পাস করিয়াছি তিনি) আমার দরখাস্তের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে অনেকখানি কি যেন লিখিয়াছেন। নিয়ম অনুসারে প্রিন্সিপালের থ্রু দিয়াই দরখাস্ত করিয়াছিলাম। বাইবেল ক্লাসে কামাই করতাম বলিয়া পাদ্রী প্রিন্সিপাল আমার উপর একটু চটা ছিলেন, ভয় হইতে লাগিল তিনি যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়া থাকেন। সে ভয় শীঘ্রই কিন্তু অপনোদিত হইল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে, প্রিন্সিপাল আমার খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। পাদ্রী প্রিন্সিপালের বিচিত্র মতিগতি কোন দিনই বুঝিতে পারি নাই, আজও পারিলাম না। সাহেব লাল পেন্সিলটা লইয়া আমার দরখাস্তের উপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখিলেন—সিলেক্‌টেড। ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিয়াই শুনিতে পাইলাম অনাদিবাবুর সহিত হেড ক্লার্ক মহাশয় আলাপ করিতেছেন। ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন

মনে হইল। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বড়সাহেবের বাল্যবন্ধু কর্ণেল —আমার পৃষ্ঠপোষক সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে আমি ভর্ত্তি হইয়া গেলাম।

দীর্ঘ ছয় বৎসরে অনেক কিছুই শিখিলাম।

অ্যামিবা হইতে সুরু করিয়া কেঁচো, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ, মাছ, খরগোস, গিনিপিগ এবং সর্ব্বশেষে মানুষ—মৃত এবং জীবন্ত মানুষ চিরিয়া জীবজগতের নানা বৈচিত্র্যের আভাস পাইলাম। সুস্থ ও অসুস্থ প্রাণীর দেহে নানা প্রকার ঔষধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ব্যাধির নানা মূর্ত্তি, প্রসব করানো, অস্ত্র-চিকিৎসা, জীবাণু-বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জুরিস-প্রুডেন্স শিখিবার আর বাকি কিছু রহিল না। সৎ এবং অসৎ উপায়ে পরীক্ষার গাঁটগুলিও একে একে পার হইলাম। অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম বইকি! সে কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ডিগ্রি-লাভই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে নিখুঁত নীতি-পথে চলিলে সব সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোলটা টানিয়া রাখ—ইহাই ছিল সকলের সত্য মনোভাব। সুনীতির একটা মুখোস অবশ্যই ছিল, কিন্তু আজ একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যে তাহা মুখোসই ছিল, আর কিছু ছিল না।

বিগত ছাত্রজীবনের কথা ভাবিতে গিয়া কয়েকটি ছবি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। অনেক ছবি মুছিয়া গিয়াছে, এই কয়টি কিন্তু এখনও বেশ উজ্জ্বল হইয়া আছে, হয়ত মনে বিশেষভাবে দাগ কাটিয়াছিল বলিয়া এখনও অবলুপ্ত হয় নাই।

নগেন বলিয়া একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। আমরা সংক্ষেপে তাহাকে 'নগা' বলিতাম। ছোটখাট মানুষটি, গলার স্বর কিন্তু ছিল

বাজখাঁই। শুনিতাম সে গাঁজা খায়। ইহাই অবশ্য তাহার পূর্ণ পরিচয় নয়, সে রেস খেলিত এবং আরও অনেক কিছু করিত। সুতরাং পড়িবার সময় পাইত না। একদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দুই জন কাবুলিওয়ালা মেসে আসিয়া তাহার বাক্স-পেঁটরা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। নগেনের পক্ষ লইয়া আমরা কাবুলিওয়ালাদ্বয়কে হাঁকাইয়া দিবার জন্য দল বাঁধিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলাম। নগেন কিন্তু আমাদের নিবৃত্ত করিল। সে হাসিয়া বলিল যে, সুদে আসলে ধারের পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে বাক্স-পেঁটরা বেচিয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশও বেচারারা উশুল করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কাবুলিওয়ালা বাক্স-পেঁটরা লইয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় নগাও কোথায় অদৃশ্য হইল। শুনিলাম সে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন নগেনের দেখা নাই। তাহার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় দর্শন দিলেন। আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়াছি, সার্জিক্যাল আউট-ডোরে আমাদের ডিউটি। হঠাৎ নজরে পড়িল, আউট-ডোরের বারান্দার এক ধারে দাঁড়াইয়া নগা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। বলা বাহুল্য, বিস্মিত হইলাম।

—কি রে, নগা যে, এত দিন পরে হঠাৎ কোথা থেকে ?

বাজখাঁই কণ্ঠকে যতটা মৃদু করা সম্ভব ততটা মৃদু করিয়া নগা বলিল —ভাই, বগলে একটা মাছের কাঁটা ফুটেছে, বার ক'রে দে, বড় কষ্ট হচ্ছে।

—বগলে মাছের কাঁটা ফুটল কি ক'রে ? সাধারণত লোকের গলাতেই মাছের কাঁটা ফুটে থাকে ?

—আমি যে আবার পরীক্ষা দিচ্ছি, জানিস না ? আজ জুলজি প্র্যাকটিক্যাল ছিল।

নগা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তবু আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বগলে কাঁটা ফুটল কি ক'রে?

—আচ্ছা বোকা ত তুই দেখছি! কাল সন্ধ্যের সময় ডোমটাকে আনা-আষ্টেক বকশিশ দিয়ে জেনে গেলাম যে আজ কি পড়বে। ওই ব্যাটারাই তো সব জোগাড় করে। ব্যাটা আমাকে বললে আজ ভেটকি মাছ পড়বে। আমি বাজার থেকে একটা ছোট ভেটকি কিনে আমাদের মেসের হরিচরণকে দিয়ে সেটা ডিসেক্‌ট্‌ করিয়ে কামিজের তলায় বগলদাবা ক'রে নিয়ে গেলাম। ভেটকি যদি দেয় ওই ডিসেক্‌ট্‌ করা মাছটা তাক-মাফিক বের করব। কিন্তু ভাই গিয়ে দেখি মাছ নয়, ব্যাঙ! কি করি, সেই ডিসেক্‌টেড ভেটকি বগলে ক'রে খানিকক্ষণ ঠায় ব'সে। তার পর আস্তে আস্তে সেটা পাচার ক'রে ব্যাঙটাই চিরলাম। কি হয়েছে ভগবানই জানেন। ডোমটার আক্কেল দেখ দিকি! কি করবে বেচারা, ওর দোষ নেই, ওই যে নতুন একজা-মিনারটা হয়েছে ও-ই লাষ্ট মোমেণ্টে ভেটকির বদলে ব্যাঙ দিতে বললে। ডোম ব্যাটা তো তাই বলছে। তুই এখন কাঁটাটা বের কর দিকি—

কাঁটা বাহির করিয়া দিলাম, নগা চলিয়া গেল।

নগার কথা শুনিয়া আপনারা যেন মনে করিবেন না যে সব ছেলেই নগার মত। ভাল ছেলে ঢের ছিল, কিন্তু নগাও ছিল। সত্যিকার ভাল ছেলে ছিল, আবার নকল ভাল ছেলেও ছিল। অধ্যয়ন করিয়া এক দল ছেলে ভাল হয়, পরীক্ষকের মনোরঞ্জন করিয়া আর এক দল ছেলে ভাল হয়। পরীক্ষকদের 'হুইম্‌' ও 'হবি'র খবর রাখা আমাদের ছাত্রজীবনের মস্ত বড় একটা কর্তব্য ছিল, এবং ভালমন্দ সকল ছেলেরই লক্ষ্য ছিল ডিগ্রী—বিদ্যা নয়।

আমাদের সময় একজন সিনিয়ার হাইস-সার্জ্জন ছিলেন। প্রাচীন লোক, বিচক্ষণ চিকিৎসক, সদয় ব্যবহার। অমন লোক দেখা যায় না। আমাদের কিসে ভাল হইবে, ভদ্রলোক অহরহ সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষা ঢের বয়স কম ছোকরা এক আই. এম. এস. অফিসার হঠাৎ তাঁহার মনিব হইয়া আসিলেন। মিলিটারি সার্ভিসের লোক, মেজাজও মিলিটারি। কারণে-অকারণে সে মেজাজ দেখাইতেও তিনি কার্পণ্য করিতেন না। প্রাচীন হাউস-সার্জ্জনটিকে এক দিন অকারণে সকলের সামনে তিনি অপমান করিয়া বসিলেন। আমি আজও তাঁহার সেই আর্ত্ত অপমানিত অসহায় মুখচ্ছবি ভুলিতে পারি নাই। তাঁহাকে একা পাইয়া বলিয়াছিলাম—সার্ চাকরি ছেড়ে দিন আপনি।

—তিন ফিগারের চাকরি, ভাই, ছাড়া কি সহজ!

একটু হাসিলেন। হৃদয়বিদারক সেই হাসিটুকু আজও মনে আছে।

আর একটা ছবিও মনে পড়িতেছে। তখন ইডেন হাসপাতালের আউটডোরে আমাদের ডিউটি। আমাদের কাজ ছিল আউটডোরে যে-সব রোগিণী আসে তাহাদের ব্যাধির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের কষ্ট কি, কত দিন হইতে ভুগিতেছে, এই সকল বিবরণ জানিয়া এবং সম্ভবপর হইলে আন্দাজি একটা রোগ নির্ণয় করিয়া আমরা আউটডোর-টিকিট লিখিয়া রাখিতাম। অধ্যাপক মহাশয় আসিলে তিনি প্রত্যেক টিকিটখানি লইয়া রোগিণীকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া এবং টিকিট-লেখক ছাত্রটিকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিয়া রোগ ও রোগিণীর সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন। এক দিন এই ইডেন আউটডোরে আমার চতুর্থ রোগিণীকে প্রশ্ন করিলাম—আপনার কি হয়েছে?

—জানি না।

—কোন কষ্ট নেই আপনার?

—না।

—এখানে এসেছেন কেন তাহ'লে ?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, পেটে একটা কি যেন হয়েছে তাই দেখাতে এনেছি।

আউটডোর-টিকিটে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। একটু পরে আমাদের অধ্যাপক আসিয়া পড়িলেন এবং যথানিয়মে একের পর এক রোগিণীদের পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এই রোগিণীটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তিনি সন্তানসম্ভবা। ইহার লক্ষণাদি লইয়া অধ্যাপক মহাশয় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দিলেন। তাহার পর অবার নূতন একটা রোগিণী আসিল, তাহার পর আবার একটা। বারোটা পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল, রোজ যেমন চলে।

আউটডোর শেষ করিয়া বাহির হইয়াছি হঠাৎ নজরে পড়িল সেই মেয়েটি গেটের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। চারি দিকে চাহিয়া সেই ভদ্রলোকটির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ আগেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এইবার লক্ষ্য করিলা মেয়েটির মাথায় সিঁদুর নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, হিন্দু ঘরের বিধবা।

—এখানে কোন্ ঠিকানায় আপনি থাকেন ?

মেয়েটি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—হ্যারিসন রোডের ওধারে কোথায় যেন—

—নম্বর জানেন ?

—না।

একটা ক্লাস ছিল, সুতরাং বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার অবসর ছিল না।

তাহাকে বলিলাম—আপনি এইখানে ব'সে থাকুন, আমি আসছি একটু পরেই আবার।

—আচ্ছা।

ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটিকে কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। তাহার বড় বড় সজল চোখ দুইটি কিন্তু মনের ভিতর আঁকা আছে।

আর একটা ছবিও আঁকা আছে।

ইমারজেন্সি-রুমে ডিউটি সেদিন। গভীর রাত্রি, টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেদিন যিনি ও. ডি. অর্থাৎ অফিসার-অন-ডিউটি ছিলেন, তিনি বসিয়া ছিলেন না, শুইয়া ছিলেন। বর্ষার রাত্রি, একটু মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। আমাদের বলিয়াছিলেন যে, খুব জরুরি কাজ না আসিলে যেন তাঁহাকে না উঠানো হয়। আমি এবং আর এক জন ছাত্র জাগিয়া বসিয়া ছিলাম। সেই সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছি, ক্রমাগত সিগারেট খাইতেছিলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে দুই জন পুলিস একটি আহত গুণ্ডাকে লইয়া ইমারজেন্সি-রুমে প্রবেশ করিল। গুণ্ডার মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। বাম চোখের ভ্রূর উপর হইতে সুরু করিয়া প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা কাটা, রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। ও. ডি. মহাশয়কে উঠাইতেই হইল—পুলিস-কেস। আমরা দুই জনে মিলিয়াই • কিন্তু চিকিৎসাটা করিলাম, তিনি অবশ্য বলিয়া দিলেন। প্রচুর আইওডিন দিয়া প্যাট প্যাট করিয়া সেলাই করিয়া দিলাম। লোকটা ঠায় বসিয়া রহিল—হুঁ হাঁ কিছুই করিল

না। রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া ও. ডি. মহাশয় আবার শুইতে গেলেন। আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

—মারামারি করতে গেছলে কেন?

সে পরিষ্কার উর্দ্দুতে যাহা বলিল তাহার বাংলা এই যে, প্রাণ থাকিতে সে তাহার স্ত্রীর অপমান সহ্য করিবে কি করিয়া! সূচ্যগ্র-দাড়ি বলিষ্ঠ, দীপ্তচক্ষু সেই গুণ্ডার মুকখানা এখনও ভুলি নাই। তাহার উক্তি সত্য কি মিথ্যা, আচরণ সঙ্গত কি অসঙ্গত, সে-সব বিচার করিবার অবসর ছিল না। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা উন্নতমস্তক গুণ্ডাটার মুখে সেদিন রাত্রে যে দুর্লভ মহিমা দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

আর একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের ওয়ার্ডে বুড়া-গোছের একটি রোগী আসিয়া এক দিন ভর্ত্তি হইল। তাহার লিভারের কাছটায় উঁচু, চক্ষু দুইটি হলুদ। সকলে ভাবিলাম, লোকটার নিশ্চয়ই কোনকালে রক্তদুষ্টি ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই এই দুর্গতি। বুড়া তারস্বরে অস্বীকার করিতে লাগিল, তাহার ওসব কিছুই কোনকালে হয় নাই। আমরা কেহই সে-কথা বিশ্বাস করিলাম না; তাহার রক্ত পরীক্ষা করানো হইল। রক্তেও কোন দোষ পাওয়া গেল না। তখনও কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হইল না, রক্তদুষ্টির চিকিৎসাই কিছু দিন ধরিয়া চলিল। অনেক দিন চিকিৎসার পর যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, তখন মনে হইল লিভারে বোধ হয় ক্যানসার হইয়াছে। অবশেষে কিছু দিন পরে বুড়ার মৃত্যু হইল। তাহার তিন কুলে কেহ ছিল না, তাহাকে পোষ্টমর্টেম করিবার সুযোগ আমরা পাইলাম। পেট চিরিয়া দেখা গেল লিভার ঠিক আছে, লিভারের ঠিক নিচেই একটা

টিউমার হইয়াছে। চিকিৎসার দোষে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা নয়, সে মরিতই, পেটের ভিতর সারকোমা হইলে কেহ বাঁচে না।

কিন্তু আমাদের কত ভুল হয়!

আর মনে পড়িতেছে সেই মড়াগুলির কথা।

সেই মড়াগুলি, যাহারা স্বেচ্ছায় নয়, অসহায় বলিয়া আমাদের ছুরির তলায় আসিয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের চিরিয়া চিরিয়া আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি, যাহারা ডাক্তারিবিদ্যারূপ মহাবজ্রনির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াও দধীচির গৌরব লাভ করিতে পারে নাই, যাহাদের সংসর্গে আমাদের দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়াছে অথচ যাহাদের আমরা চিনি নাই, সেই সব অখ্যাত অজ্ঞাত বিকৃত বীভৎস মড়াগুলির কথা এখনও ভুলি নাই। সেই প্রথম দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে—সেই যেদিন অ্যানাটমি হলে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল সামনের টেবিলটার উপর রহিয়াছে মড়া নয়, একখানা কাটা হাত।

ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায় এম. বি. বসিয়া বসিয়া আত্মজীবনচরিত লিখিতেছিল। ডাক্তারের পক্ষে কাজটা অদ্ভুতই। ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী লেখার কোন সার্থকতা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। বিমলের নিজের কাছে কিন্তু ইহার একটা সঙ্গত অজুহাত ছিল। সময় কাটানো চাই ত! হাসপাতালে ছয় মাস হাউস-সার্জ্জনি করার পর হইতে সে একরূপ বেকার অবস্থাতেই বাড়ীতে চুপচাপ বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে একটা বৎসর কাটিয়া গেল, সুবিধা-মত কিছুই জুটিতেছে না। পিতামাতা মারা গিয়াছেন, বোনগুলির

বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নাবালক ভাই নাই তথাপি কিন্তু বিমল নির্ঝঞ্ঝাট নয়। পিতা তাহার স্কন্ধে কিছু ঋণ এবং একটি বধূ চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বধূ মণিমালা আপাতত বাপের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে বটে এবং এম. বি. ডাক্তারের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও হয়ত নিজের এম. বি. স্বামীর সম্বন্ধে মনে মনে কিঞ্চিৎ মোহ পোষণ করিতেছে, কিন্তু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে এ মোহ কতদিন টিকিবে! কেবল মাত্র ডিগ্রিটা আস্ফালন করিয়া বেশী দিন তাহাকে মুগ্ধ রাখা যাইবে না। কিন্তু উপায় ত তেমন কিছু—

বিমল পুনরায় ঝুঁকিয়া আত্মজীবনচরিত স্থরু করিতে যাইতেছিল এমন সময় পিয়ন আসিয়া হাজির হইল এবং একটি খামের চিঠি দিয়া গেল। বিমল উল্টাইয়া দেখিল, মণির চিঠি নয়—অত্যন্ত অপরিচিত হস্তাক্ষরে এ কাহার চিঠি! চিঠিখানা পড়িয়া কিন্তু তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লাগিয়া গিয়াছে তাহা হইলে! মাহিনা মাত্র পঁচাত্তর টাকা—তা হোক! ফ্রি কোয়াটার্স আছে, হাতে একটা হাসপাতাল আছে। আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটা মুড়িয়া রাখিয়া সে উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

২

ট্রেন আধ ঘণ্টা লেট ছিল। পৌঁছিবার কথা সাড়ে ন-টায়, দশটা বাজিয়া গেল। উদগ্রীব বিমল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ছিল, ষ্টেশনের চেহারাটা দেখিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইল না। অতি ছোট ষ্টেশন, এখানে ওখানে দুই-তিনটা কেরোসিনের আলো টিমটিম করিয়া

জলিতেছে, জাঁকজমক দূরের কথা, একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম পর্য্যন্ত নাই। বিমল মনে মনে দমিয়া গেল। কুলির সাহায্যে নিজে স্যুটকেস, বিছানা এবং মাইক্রোস্কোপের বাক্সটা লইয়া সে নামিয়া পড়িল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল যদি সেক্রেটারি মহাশয় কোন লোক পাঠাইয়া থাকেন। নজরে পড়িল ওদিকের একটা থার্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখে ভয়ানক ভিড়, একটা কলরব উঠিয়াছে। এমনই গাড়ীতে যথেষ্ট ভিড়, ইহার উপর আবার এতগুলি লোক চড়িবে! বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

—কোথা যাবেন বাবু আপনি,? কুলিটা প্রশ্ন করিল।

—হাসপাতালটা কত দূরে, জানিস? মিউনিসিপাল হাসপাতাল?

—কাছেই।

থার্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল।

—ওখানে কি হ'ল?

—কি জানি বাবু।

একটি লোক ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, প্রশ্নটা শুনিয়া বলিল—ও কিছু নয়, একটা বুড়ী পড়ে গেছে, এমন সব হুড়মুড়িয়ে উঠতে যায়!

গার্ডসায়েব হুইস্‌ল দিয়া নীল বাতি নাড়িতে লাগিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার ভিড়ের কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিলেন—এই উঠে পড় সব, উঠে পড় সব, ট্রেন ছাড়ছে!

'যে যেমন পারিল উঠিয়া পড়িল, বিমল একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল, আহত বুড়ীটা তালগোল পাকাইয়া একটা পুঁটুলির মত ষ্টেশনের প্লাটফর্মে পড়িয়া আছে। ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছে। বিমলের কৌতূহল হইল, একটু আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া সে বুড়ীটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

—আরে মোলো এ মাগী এখানে পড়ে রইল যে।

একচক্ষু লণ্ঠনহস্তে হস্তে বিব্রত স্টেশনমাস্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিমল বলিল—ওর লেগেছে। আপনার আলোটা দিন তো একটু দেখি—

দেখা গেল বুড়ীর আঘাত সত্যই গুরুতর; তাহার শতছিন্ন ময়লা কাপড়চোপড় রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। বিমল একটু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিল, রক্তপাতের ফলে বেশ দ্রুত হইয়াছে। স্টেশনমাস্টার চীৎকার করিতে লাগিলেন—ভাগিয়া ভাগিয়া, এ ব্যাটা আবার কোথা গেল—চন্দু চন্দু—স্ট্রেচার নিকালকে এই বুঢ়িয়া কো হাসপাতাল মে লে যাও! যত ফ্যাসাদ জুটবে মশাই আমারই ডিউটির সময়! কাল হ'ল কি—

বিমল বলিল—কোন্ হাসপাতালে পাঠাবেন?

—আমাদের রেলওয়ে হাসপাতালে, জগুবাবুর কাছে, আর কোথা—

—কতদূর এখান থেকে?

—তা বেশ দূর আছে, মাইল-দুই হবে—

বিমল হাসিয়া বলিল—এখুনি কিন্তু এর ব্যবস্থা করা দরকার। মিউনিসিপাল হাসপাতাল কত দূর?—

—সে তো কাছেই—ঐ তো দেখা যাচ্ছে! কিন্তু ও হাসপাতালের বিলিব্যবস্থাই আজব রকম। ডাক্তার থাকে তো ওষুধ থাকে না, ওষুধ থাকে তো ডাক্তার থাকে না! এক পাগলা ডাক্তার আছে—তারও শুনছি চাকরি, গেছে—ওই চন্দু—চন্দু—

—আমিই মিউনিসিপাল হাসপাতালের নতুন ডাক্তার, এই ট্রেনে এলাম—

—ও তাই নাকি—তা বেশ বেশ—পরেশ বাবুর কাছে শুনছিলাম বটে—বেশ বেশ! চন্দু—এই চন্দু—

চন্দু দুধ দুইতে গেছে।

ঘরের ভিতর হইতে কে যেন বলিল।

—ও তাই নাকি,—ভাগিয়াটা গেল কোথা—

একটু ইতস্তত করিয়া স্টেশনমাস্টার মহাশয় বলিলেন—আপনার কাছেই পাঠিয়ে দি তাহলে বুড়ীটাকে—ভালই হল!

—আমি এখনও হাসপাতালে পা-ই দিই নি, আচ্ছা বেশ দিন।

—আমি তাহ'লে এগিয়ে যাই, হাসপাতালটা কোন্ দিকে বলুন তো?

—আমি জানি বাবু, চলুন,—কাছেই।

যে-কুলিটা বিমলের জিনিষপত্র নামাইয়াছিল, সে-ই বলিল।

—পাঠিয়ে দিন তাহ'লে, আমি চললাম—নমস্কার! বেশী দেরি কর্‌বেন না যেন, বুড়ীর অবস্থা সুবিধের নয়।

—এখুনি দিচ্ছি, আপনি এগোন।

কুলির পিছনে পিছনে বিমল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মটা পার হইয়া কিছু দূর গিয়াছে এমন সময় একটা টর্চের তীব্র আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল।

—আরে, বিমল যে এসে পড়েছ দেখছি—বাঃ!

—পরেশ-দা! আপনি কোথা থেকে?

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—আমি আজকাল এখানেই পোস্টমাস্টার—সম্প্রতি এসেছি। বদিবাবু সেদিন যখন বললেন যে এবার যে নতুন ডাক্তার আসছে তার নাম বিমল চাটুজ্যে, তখনই আমার সন্দেহ

হয়েছিল যে এ আর কেউ নয় আমাদের সেই বিমল—ওরে ওদিকে কোথা যাচ্ছিস্ ?

কুলি বলিল—বাবু বললেন যে হাসপাতালে যেতে।

বিমল বলিল—আমার কোয়ার্টার্স টা কোন্ দিকে বলুন তো ?

চলিতে চলিতে পরেশ-দা বলিতে লাগিলেন—তোমার কোয়ার্টার্স এখন খালি নেই, আগেকার ডাক্তারবাবু এখনও আছেন, চার্জ দিয়ে তবে ছাড়বেন। তুমি ক-দিন আমার বাসাতেই থাকবে আপাতত, বদিবাবু তাই বলেছিলেন আমাকে। আমারই উপর ভার ছিল তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করবার। আমার ক্যাশ মেলাতে মেলাতে দেরি হয়ে গেল, ঠিক সময়ে আসতে পারলাম না। একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—ক্যাশও মিললো না—অথচ—যাক তুমি ঘরের লোক তোমার কাছে নো ফরম্যালিটি—

পরেশ-দা স্মিতমুখে বিমলের পানে চাহিলেন।

বিমল বলিল—আমাকে কিন্তু হাসপাতালে এক বার যেতে হবে।

—এত রাত্রে কেন ?

—একটা রুগী জুটেছে স্টেশনে।

—তাই নাকি !

পরেশ-দা কুলিটাকে বলিলেন—আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি, তুই জিনিষগুলো আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আয়—

—আচ্ছা বাবু। কুলি চলিয়া গেল। পরেশ-দা তখন বিমলকে বলিলেন—চল এইবার তোমার হাসপাতালে যাওয়া যাক। কি রুগী ?

—একটা বুড়ী স্টেশনে পড়ে গেছে তাকেই নিয়ে আসবে।

—ও।

ক্ষণকাল থামিয়া পরেশ-দা বলিলেন—গুপিবাবু আছেন কি না সন্দেহ, চল দেখা যাক্।

—গুপিবাবু কে?

—কম্পাউণ্ডার।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডেই তাঁর কোয়ার্টার্স, কিন্তু তিনি প্রায় এ সময়টা থাকেন না, পাশা খেলতে যান চৌধুরীদের বৈঠকখানায়।

কথাটা বিমলের ভাল লাগিল না। পাশা খেলিতে যান! জিজ্ঞাসা করিল—হাসপাতালে ইনডোর রুগী তো থাকে।

কুড়িটা বেড আছে বটে, তবে থাকে না বিশেষ কেউ। হয়ত দুই-এক জন আছে, ঠিক জানি না আমি—এই এসে পড়েছি এবার—এই তোমার হাসপাতাল—

বিমল অন্ধকারের আবছাভাবে যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতেই তাহার বেশ ভাল লাগিল—নিতান্ত ছোট তো নয়। চতুর্দ্দিকে কিন্তু অন্ধকার, জনপ্রাণীর সাড়া নাই।

পরেশ-দা হাঁকিতে লাগিলেন—জান্‌কী, জান্‌কী—

গেটের পাশের ঘরটা হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইল। পরেশ-দা বলিলেন—এই হচ্ছে হাসপাতালের মেথর। তাহার পর জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ইনি হচ্ছেন নূতন ডাক্তারবাবু।

জান্‌কী ঝুঁকিয়া সেলাম করিল।

পরেশ-দা প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুর কোথা. ভৈরব কোথা?

ঠাকুর হাসপাতালের পাচক এবং ভৈরব চাকর। বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতে লাগিল পরেশ-দা অনেক খবর রাখেন তো হাসপাতালের! জান্‌কী বলিল, তাহারা বাহিরে গিয়াছে।

—গুপিবাবু ?

নিকটেই গুপিবাবুর বাসা, জান্‌কী খোঁজ লইয়া আসিল, গুপিবাবু এখনও ফেরেন নাই।

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—বললাম তিনি চৌধুরীর ওখানে আছেন। ওরে, তুই বসবার ঘরটা খুলে দিয়ে একটা লণ্ঠন জ্বেলে দে, আর গুপিবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, বলগে যা নূতন ডাক্তারবাবু এসেছেন ডাকছেন। এক কাজ কর, তোর রুক্‌মিকে না-হয় পাঠা কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে আনুক, তুই ঘরটরগুলো খোল—

হাসপাতালের ভিতর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কে যেন কাতরাইতেছে।

বিমল প্রশ্ন করিল—ও কিসের শব্দ !

জান্‌কী বলিল—ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী আছে।

বিমল না ভাবিয়া পারিল না, ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী গা ঙাইতেছে অথচ আলো নাই, কম্পাউণ্ডার নাই, চাকর-ঠাকুর কেহ নাই, এ তো বড় অদ্ভুত অবস্থা।

স্ট্রেচার-বাহিত হইয়া স্টেশনের রোগীটিও আসিয়া পড়িল। বিমল জান্‌কীকে বলিল—একটা আলো চাই।

—রুক্‌মি, রুক্‌মি, বাত্তি লেআ—

মেথরের বউ রুক্‌মি শশব্যস্ত হইয়া একটা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইল এবং বিমলকে একবার আড়চোখে দেখিয়া বাত্তিটা হাসপাতালের বারান্দার উপর নামাইয়া রাখিল।

পরেশ-দা রুক্‌মিকে বলিলেন—তুই কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় চট ক'রে—বল্ নূতন ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কম্পাউণ্ডারবাবু সন্ধ্যার সময় কোথায় থাকেন তাহা সকলেই জানে,

সুতরাং রুক্মি কোন প্রশ্ন করিল না, চৌধুরীবাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেল। লে-বাতিটা রুকমি রাখিয়া গেল। সেটা হাসপাতালেরই বাতি, ঐ কালাজ্বর রোগীটার কাছেই থাকিবার কথা, কিন্তু রুক্মিরাই ওটা রোজ ব্যবহার করে। রুক্মির রান্না তখনও সমাপ্ত হয় নাই, অসময়ে এই সব উপদ্রব তাহার ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু নূতন ডাক্তারবাবু কি রকম মেজাজের লোক তাহা ঠিক জানা নাই। লক্ষ্য করিলে বিমল রুক্মির মুখের অপ্রসন্নতাটুকু দেখিতে পাইত। একটা জিনিষ কিন্তু বিমল লক্ষ্য করিল—জান্‌কীটি বেশ কাজের লোক, ইংরাজীতে যাহাকে বলে এক্‌স্‌পার্ট। সে অল্প সময়ের মধ্যে কপাট খুলিল, আর একটা আলো জ্বালিল। স্টেশন হইতে আগত বুড়ীটাকে টেবিলের উপর শোয়াইল, একটা ক্ষুদ্র ধমক দিয়া কালাজ্বর রোগীর গোঙানি বন্ধ করিল, টিঞ্চার আইওডিন, তুলা ব্যাণ্ডেজ বাহির করিল এবং সাবানের কৌটাটা বিমলের হস্তে দিয়া জলপূর্ণ মগহস্তে বারান্দার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

বিমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল বুড়ীর আঘাত গুরুতর।

হাতের কনুইয়ের কাছে একটা শিরা কাটিয়া গিয়াছে এবং অবিরাম রক্ত পড়িতেছে। আইওডিন তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলে এ রক্তপাত বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরও খানিকটা চিরিয়া আর্টারিটাকে বাঁধিয়া দিলে যদি কিছু হয়।

জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বিমল প্রশ্ন করিল—ছুরি-টুরি কোথায় আছে ?

—আলমারিতে।

—চাবি কোথা ?

—এখানেই আছে বাবু।

জানকী চট্ করিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবির একটা থোলো আনিয়া বিমলের হস্তে দিল এবং সার্জিকাল আলমারির চাবি কোন্‌টা তাহাও দেখাইয়া দিল। ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার মত সময় নাই, অবিলম্বে প্রতিকার না করিলে বুড়ীর শরীরে যতটুকু রক্ত আছে বাহির হইয়া যাইবে। বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া ছুরি, আর্টারি-ফরসেপস্, কাঁচি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিল।

পরেশ-দা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—অপারেশন করবে নাকি ?

বিমল একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—ও ছাড়া উপায় নেই—

বিধি অনুযায়ী ছুরি প্রভৃতি স্টেরিলাইজ করা উচিত, কিন্তু তাহা করিবার সময় নাই, খানিকটা লাইজল থাকিলেও হইত, কিন্তু তাহাও হাতের কাছে পাওয়া গেল না। টিঞ্চার আইওডিন দিয়া যতটা হয়।

জানকী লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিল, বিমল অপারেশন শুরু করিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে বেশী বেগ পাইতে হইল না, ছিন্ন শিরার মুখটা চট্ করিয়াই পাওয়া গেল। ...অপারেশন শেষ করিয়া বিমল যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছে তখন পরেশ-দা বলিলেন—এই যে গুপিবাবুও এসে গেছেন।

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, প্রৌঢ় একটি লোক ঘাড়টি ঈষৎ নামাইয়া চশমার কাচের উপর দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কাঁচাপাকা গোঁফ, গলদেশে একটি পাকানো চাদর। বিমলের সহিত চোখাচোখি হইতেই গুপিবাবু মুখে একটু হাসির ভাব টানিয়া আনিয়া নমস্কার করিবার মত একটা ভঙ্গী করিলেন।

বিমল প্রশ্ন করিল—অ্যান্টিটেটানাস সিরাম আছে ?

গুপিবাবু মুখটা ফিরাইয়া মুচ্‌কি হাসিটুকু ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—ওসব কোথা পাবেন এখানে—

—হাসপাতালে নেই ?

—না।

—বাজারে পাওয়া যাবে !

—জগদীশবাবুর দোকানে পাওয়া যেতে পারে বোধ হয় উনি একটু আপ্‌টুডেট্‌।

—তাই একটা কিনে আনুন, কিনে এনে দিয়ে দিন এক্ষুনি।

গুপিবাবু দাঁড়াইয়া ইতস্তত কবিতে লাগিলেন। সাবান দিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বিমল বলিল—যান চট্‌ করে নিয়ে আসুন, আমি লিখে দিচ্ছি—কাগজ-কলম কোথা, হাত ধুইয়া তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে বিমল পুনবায় বলিল—কই কাগজ-কলম দিন।

গুপিবাবু একটা তটস্থ ভাব দেখাইয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় জানকী কাগজ-কলম আনিয়া হাজির করিল। বিমল প্রেসক্রপশন লিখিয়া দিতেই গুপি বাবু সেটা লইলেন এবং চশমার কাচের উপর দিয়া মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন—জগদীশবাবুর দোকানে নগদ দাম না দিলে—

—ও

বিমল ক্ষণকাল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল, তাহার পর পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া দশ টাকার একখানা নোট গুপিবাবুর হাতে দিয়া বলিল—এই নিন, যান।

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন।

হঠাৎ বিমলের নজরে পড়িল সেই কালাজ্বর রোগীটাও উঠিয়া আসিয়াছে, জরাজীর্ণ দেহ, পাঁজরার হাড়গুলা গোনা যাইতেছে। হঠাৎ

এই রাতদুপুরে অপারেশনের অস্বাভাবিকতা তাহাকেও বিচলিত করিয়াছে। বিস্মিত ভাবে সে বিমলকে দেখিতেছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

—আমি? কই না।

তাহার পর জানকীর দিকে একবার মিনতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া পুনরায় বিমলের দিকে ফিরিয়া সকরুণ কণ্ঠে বলিল—আমি কেন চেঁচাতে যাব বাবু, দয়া ক'রে এখানে থাকতে দিয়েছেন সেই আমার ঢের—আমি মুখটি বুজে পড়ে আছি। মন্থর পদক্ষেপে সে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বেচারা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে।

জানকী বুড়ীটাকে বিছানায় শোওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। বিমল উঠিয়া গিয়া তাহার নাড়ীটা একবার দেখিল। দেখিল খুব দুর্ব্বল। ব্রাণ্ডি দিয়া একটা ঔষধের প্রেসক্রপশন লিখিয়া সে জানকীকে বলিল যে কম্পাউণ্ডার বাবু আসিলে এই ঔষধটা যেন খাওয়াইয়া দেন।

—আচ্ছা হুজুর।

—চল বিমল, এবার যাওয়া যাক। পরেশ-দা বলিলেন।

—হ্যাঁ চলুন।

—তোমার বৌদি নেই, নিজেদেরই গিয়ে রান্নাবাড়া করতে হবে। ক্যাশটাও মেলাতে হবে আমাকে—

বিমল অন্যমনস্ক ছিল। বলিল চলুন।

রুক্মি বারান্দার থামের কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল।

পরেশ-দা ও বিমল গেট হইতে বাহির হইতে-না-হইতে সে ছোঁ মারিয়া লণ্ঠনটা লইয়া চলিয়া গেল।

৩

পরদিন সকালে উঠিয়াই বিমল নিজের বাসাটা দেখিতে গেল। গঙ্গার ধারে ছোটখাট বাসাটি বেশ চমৎকার—একটু দূর হইতে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বিমল দেখিতে লাগিল। পরেশ-দা সঙ্গে ছিলেন, বলিলেন—পাগলা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে না কি এখুনি।

বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিতেছিল মণির এ-বাসাটা পছন্দ হইবে কিনা। মণি আবার একটু খুঁতখুঁতে ধরণের। এই মফস্বল জায়গায় হয়তো তাহার—

পরেশ-দা পুনরায় বলিলেন—দেখা করবে নাকি! এখনও হয়ত ওঠেই নি পাগলা।

বিমল বলিল—বেশ তো চলুন না, —সত্যিই পাগল নাকি?

—ছিট আছে।

কাছে আসিয়া দেখা গেল, বাড়ীর দরজাটা খোলা রহিয়াছে।

—প্রকাশবাবু, ও প্রকাশবাবু।

শব্দ শুনিয়া লোম-ওঠা একটা কুকুর বাড়ীর ভিতর হইতে ছুট করিয়া বাহির হইয়া গেল; পরেশ-দা একটু হাসিলেন।

—প্রকাশবাবু—

—কে—

রক্তচক্ষু বিরাট্‌বপু প্রকাশবাবু অসম্বৃত বসনটা সামলাইতে সামলাইতে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। কুচকুচে কালো রং, প্রকাণ্ড ভারি মুখ, সদ্যনিদ্রোত্থিত বলিয়া চোখ দুটি লাল লাল।

—কি চান?

—ইনিই নতুন ডাক্তার, বিমলবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন,—কাল রাত্তিরে এসেছেন।

প্রকাশবাবু ক্ষণকাল বিমলের মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিলেন ও তৎপরে বলিলেন—ও আসুন, নমস্কার।

—নমস্কার।

বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল তুমি তাহলে আলাপ-টালাপ ক'রে এস আমার ওখানে। আমি যাই ডাকগুলো কাট্‌তে হবে—

—আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। ভিতরে ঢুকিয়াই বিমলের চোখে পড়িল উঠানের উপর একটা দড়ির খাটিয়ায় বাঁখারিসহযোগে একটি মশারি টাঙানো আছে ঠিক বলা চলে না কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। খাটের এক ধারে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন বসান রহিয়াছে এবং তাহার পাশেই বিখ্যাত ডাক্তারি কাগজ 'ল্যান্‌সেট্' একখানা। উঠানের মাঝামাঝি একটা তার খাটানো, তাহাতে একখানি গামছা শুকাইতেছে।

বিমল বলিল—আপনার বুঝি বাইরে শোয়া অভ্যেস ?

চকিতে একবার খাটিয়াটার পানে চাহিয়া প্রকাশবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, কি শীত কি গ্রীষ্ম! আসুন ভেতরে বসা যাক।

ঘরের ভিতর গিয়াও বিমল দেখিল প্রকাশবাবুর আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। ঘরের ভিতর একটি চৌকি, একটি টেবিল আর একখানি চেয়ার রহিয়াছে।

—একাই ছিলেন নাকি এত দিন এখানে ?

—না, ফ্যামিলি জিনিষপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি, এই বার আপনার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে আমিও রওনা হয়ে পড়ব—হা-হা-হা—বসুন, বসুন।

প্রকাশবাবু চৌকিটাতে উপবেশন করিলেন, বিমল চেয়ারে বসিল। বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিল—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন এখান থেকে ?

—আপনি ঐ কথা জিজ্ঞেস করছেন আব আমি ক-দিন থেকে ভাবছি আমি ছিলাম কেন এখানে এতদিন ? নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই তো নেই—হা-হা-হা-হা—

—কতদিন ছিলেন আপনি এখানে ?

—ছ-মাস, তার আগে ছিলাম চা বাগানে, কিছু দিন জাহাজে জাহাজেও ঘুরেছি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও ছিলাম কিছু দিন। কিন্তু এখন দেখছি নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই আর বেশী নেই, এইবার ডিসেন্‌ট্‌লি যা হোক একটা কিছু করতে হবে।

—কোথাও ঠিক করেছেন না কি কিছু ?

—ঠিক ? ঠিক কি কখনও কিছু হয় মশাই ! জনসমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোথাও-না কোথাও ভিড়ে পড়ব আবার ! তবে এবার ডিসেন্‌ট কিছু না দেখলে আর সহজে ভিড়ছি না। গান শুনব অক্রূর-সংবাদ পয়সা দেব একটি—ওর মধ্যে আর নেই আমি—হা-হা-হা-হা—

বিমল অনুভব করিল এই বিকট হাসির জন্যই বোধ হয় সকলে ইহাকে পাগল আখ্যা দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে ভদ্রলোকের চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বারপ্রান্তে ভৃত্য-জাতীয় এক ব্যক্তি দর্শন দিল।

—বাবু, কাল আবার আপনি কপাট খুলে রেখে শুয়েছিলেন কুকুরে সর খেয়ে গেছে—

—আবার !

চকিতের মধ্যে প্রকাশবাবুর মুখের হাসি নিবিয়া গেল, দারুণ ক্রোধে

সমস্ত মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল। বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দেখুন, কতকগুলো লোম-ওঠা খেঁকি কুকুর আছে এ পাড়ায়, এ পাড়ায় কেন সর্ব্বত্রই—মিউনিসিপালিটিকে ব'লে ব'লে আমি হার মেনে গেলুম মশাই, এক ধাম্মিক চেয়ারম্যান জুটেছে সে কিছুতেই কুকুর মারতে দেবে না। অথচ প্রতি বছরই পাগলা কুকুরে লোককে কামড়াচ্ছে! আর আমি তো নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম—দিজ ডগ্‌স্ আর প্লেইং হেল্ উইথ্ মি—জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে! ব্যাটাচ্ছেলে ভণ্ড কোথাকার!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

ভৃত্যটি ইতস্ততঃ করিতেছিল—প্রকাশবাবু বলিলেন ভৈরব, ইনিই নূতন ডাক্তারবাবু, চা-টা খাওয়াও এঁকে, কিছু খাবারও নিয়ে এস।

ভৈরব ঝুঁকিয়া বিমলকে প্রণাম করিল।

প্রকাশবাবু বলিলেন—ও ঘরের তাকে একটা খালি সিগারেটের টিনে কিছু পয়সা আছে দেখো—

ভৈরব চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই খালি সিগারেট-টিনটি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

—কই, একটি পয়সাও তো নেই এতে বাবু!

—নেই? সে কি, এই তো পরশুদিন একটা টাকা ভাঙিয়ে রেখেছিলাম।

নিরীহের মত মুখ করিয়া ভৈরব বলিল—খরচও তো হয়েছে, কাল তেল আনালেন, সিগারেট আনলাম, আরও সব যেন কি কি—

প্রকাশবাবু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

—ভাল কথা মনে পড়েছে, সিগারেট খান আপনি, ওরে আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আয়।

ভৈরব চলিয়া গেলে একটা স্যুটকেস তিনি চৌকিটার তলা হইতে

টানিয়া বাহির করিলেন। বিমল দেখিল স্যুটকেসে চাবির বালাই নাই। ডালাটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রকাশবাবু বিমলের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন—আর একটি মাত্র বাকি রইল, তার পর স্যুটকেসটা পুনরায় চৌকির তলায় ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—একেবারে নিঃস্ব হবার আগে সরে পড়তে চাই —হা-হা-হা-হা—চলুন আজই আপনাকে চার্জ্জটা দিয়ে দিই—

ভৈরব সিগারেট ও দিয়াশালাই লইয়া আসিতেই প্রকাশবাবু তাহার হাতে দশটাকার নোটটি দিয়া বলিলেন—এইটে ভাঙিয়ে চট্ ক'রে কিছু খাবার আনো গিয়ে।

বিমল বলিল—কেন ও-সব হাঙ্গামা করছেন।

প্রকাশবাবু বিমলের দিকে এক বার মাত্র চাহিয়া পুনরায় ভৈরবকে বলিলেন—ওই চণ্ডীর দোকান থেকে নিও না যেন, একের নম্বর স্কাউণ্ড্রেল ব্যাটা, দেরি ক'রো না, চা করতে হবে, যাও।

বিমল পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রকাশবাবু সে অবসর দিলেন না, কাপড়ের কসিটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন—এই জায়গা-টার কুকুর বিড়াল মানুষ বাঁদর সব পাজি, আপাদমস্তক পাজি—

—তাই নাকি ?

—উফ্ !

একটু পরে বিমল যখন পরেশ-দার বাসায় ফিরিয়া গেল তখন তাহার প্রকাশবাবুর সম্বন্ধে ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। লোকটার পড়াশোনা অদ্ভুত, এ-রকম স্থানে তাঁহার বিদ্যাবত্তা বুঝিবার লোক না থাকাই সম্ভব। বায়োকেমিস্ট্রি সম্বন্ধে যেরূপ বক্তৃতা দিলেন ভদ্রলোক, বিমলই সব কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ-রকম লোকের কোথাও অধ্যাপক

হওয়া উচিত। কিন্তু—। ঐ 'কিন্তু'তেই আমাদের দেশে সব কিছু আটকাইয়া যায়। ঐ 'কিন্তু'টা যে কি জটিল বস্তু তাহা বোঝানো শক্ত। সমস্ত শুনিয়া পরেশ-দা বলিলেন— হ্যাঁ এদিকে বেশ লেখাপড়া জানেন ভদ্রলোক, এম. এসসি, এম. বি—কিন্তু ঐ এক দোষ। ঠিক সময়ে হাসপাতালে যেত না, বকছে ত বকছেই, হাসছে ত হাসছেই, চটলে ত রক্ষে নেই খুনই করে ফেলবে। বিমল কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—চল তোমাকে এইবার বদিবাবুর সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই, কাছেই বাড়ী। ওহে হরেন, তুমি ততক্ষণ থেকো একটু এখানে, আমি আসছি একটু বদিবাবুর বাসা থেকে—আমি এলে তার পর বেরিও—

হরেন বলিল—আজ্ঞে আচ্ছা!

হরেন পিওন। পরেশ-দা এখানে পোস্টমাস্টার হইয়া আসাতে হরেন বেচারারই বিপদ হইয়াছে। পরেশদার চিরকালকার স্বভাব নিজের চরকাটি ছাড়া সকলের চরকায় তৈল প্রদান করা। আশেপাশের সকলের সব খুঁটিনাটি খবরটি তাঁহার রাখা চাই, সমস্ত লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশা চাই, প্রত্যেক ব্যাপারেই সুযোগ পাইলে মুরুব্বিয়ানা করা চাই। পরেশ-দা এখানকার ফুটবল ক্লাবের রেফারি, সারস্বত মন্দির অর্থাৎ বাংলা লাইব্রেরির সেক্রেটারি, কংগ্রেসী বদিবাবুর সহচর, স্থানীয় যুবক-সমিতির পৃষ্ঠপোষক, আঢ্যিদের টেনিস ক্লাবের কর্ণধার। সুতরাং যেরূপ অখণ্ড মানযোগের সহিত তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য করা উচিত তাহা তিনি করিতে পারেন না। হরেনকেই অর্দ্ধেক কাজ করিয়া দিতে হয়। রোজই রাত্রে ক্যাশ লইয়া দুর্ভাবনা হয়, কিছুতেই মেলে

না। অথচ পরেশ-দার উপর সকলেই খুশী। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এখানে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন।

পথে যাইতে যাইতে পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—এই বদিবাবু লোকটির ভয়ানক ইনফ্লুয়েন্স এখানে, মাড়োয়ারিমহল ওঁর কথাতেই ওঠে বসে। বদিবাবুকে যদি খুশী করতে পার মাড়োয়ারি-মহলে তোমার একচেটে প্রাকৃটিস হয়ে যাবে।

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া পরেশ-দা বলিলেন—তোমাকে না-দেখেই তুমি চাটুজ্যে শুনেই তোমার উপর একটা টান হয়েছে। এদিকে বদিবাবুর একটু, যাই বল তুমি, ইয়ে আছ। উনিই তো হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারি, তুমি চাটুজ্যে ব'লে উনি কি কম লড়েছেন তোমার জন্যে! তোমাদের কমিটিতে হরেন বোস ব'লে এক ভদ্রলোক আছেন তাঁরও এক জন নিজের লোক ছিল ক্যাণ্ডিডেট্, কিন্তু বদিবাবুর সঙ্গে হরেন বোস পারবে কেন, ভোটে হেরে গেল! বদ্যিনাথ চাটুজ্যের সঙ্গে পারা বড় চাট্টিখানি কথা নয়!

বিমল বলিল—তাই না কি!

—নিশ্চয়! পুরুষসিংহ যাকে বলে! গিয়েই প্রণাম ক'রো' খুশী হবেন! ভারি অমায়িক লোক এদিকে।

—কি করেন?

—ওকালতি, বেশ ভাল প্রাকটিস ক্রিমিনাল সাইডে—

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঁর বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হ'লে কে চিকিৎসা করে?

—জগদীশবাবুর সঙ্গে ওঁর ভাব আছে যথেষ্ট, কিন্তু উনি ডাক্তারি ওষুধ বিশেষ পছন্দ করেন না, উনি কবরেজি কিংবা হাকিমি ওষুধের পক্ষপাতী—

—ও, তাই না কি ?

বিমল ভাবিয়া পাইতেছিল না কি উপায়ে এই পুরুষসিংহটিকে খুশী করিতে পারিবে। ডাক্তারি ঔষধই যে ব্যক্তি পছন্দ করে না তাহাকে খুশী করা তো সহজ হইবে না! নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিয়া বিমল বলিল—পরেশ-দা, বেশী দেরি করা চলিবে না, প্রায় সাতটা বাজে, হাসপাতালে যেতে হবে। প্রকাশবাবু সাড়ে সাতটায় যাবেন বলেছেন, তাছাড়া কালকের সেই রুগীটা কেমন রইলো জানবার জন্যে মনটা ছটফট করছে—

পরেশ-দা বলিলেন—না বেশী দেরি হবে না।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আটঘাট বেঁধে নিয়ে তার পর কাজ সুরু ক'রে দাও না তুমি! এ-বেলা বদিবাবু তো হয়ে গেল ও-বেলা চেয়ারম্যান আর জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই আপাতত নিশ্চিন্দি! বাকি মেম্বারদের সঙ্গে তার পর ধীরেসুস্থে দেখা করিলেই চলিবে—

—চেয়ারম্যান কে ?

—রাখাল নন্দী, ধর্ম্ম-ধর্ম্ম বাই, কিন্তু টাকার কুমীর। তোমাদের হাসপাতালের ইনডোর রুগীদের খাওয়ার খরচ ওই একা দেয়।

একটু থামিয়া বিমল বলিল—জগদীশবাবু ডাক্তারও কি হাসপাতাল কমিটির মেম্বার না কি ?

—নিশ্চয়ই, বেশ শাঁসালো মেম্বার। ও লোকটিকেও হাতে রাখতে হবে, বড় গভীর জলের মাছ—

বিমল মনে মনে একটু চিন্তিতই হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগুলিকে সে একা কি করিয়া খুশী করিয়া রাখিবে! ইহা তো রীতিমত সমস্যার আকার ধারণ করিতেছে! আরও কিছুক্ষণ

চলিবার পর পরেশ-দা বলিলেন—ঐ যে বদিবাবু বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

বিমল দেখিল একটা বড় বাড়ীর গেটের সম্মুখে দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে একটি খদ্দরের ফতুয়া, খদ্দরের একটি কাপড় লুঙ্গির মত করিয়া পরা, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, হস্তে একটি নিমের দাঁতন।

—পরেশবাবু যে, আসুন আসুন! সঙ্গে ওটি কে?

বিমল অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল চাটুজ্যে, আপনাদের নতুন ডাক্তার—

—আরে, তাই নাকি বাঃ বাঃ বাঃ—আসুন ভেতরে আসুন।

তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—সব খবর পেয়ে গেছি ভোরেই।

বিমল বুঝিতে পারিল না কিসের খবর। বদিবাবু সামনের দাঁতে দাঁতনটাকে বার-দুই ঘষিয়া বলিলেন—আপনার রুগীকে দেখেও এসেছি, ভাল আছে বুড়ী।

তাহার পর বিমলের পিঠটা চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ, এই তো চাই! চাটুজ্যে না হ'লে কি এ আর কারও দ্বারা সম্ভব হ'ত? কি বলেন পরেশবাবু, আসুন ভেতরে, আমি ততক্ষণ মুখটা ধুয়ে আসি।

বদিবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। পরেশ-দার সহিত বিমল ভিতরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ারে বসিল! একটু পরেই বদিবাবুর দুই জন মক্কেল, তিন জন কংগ্রেসকর্ম্মী, সাহায্যপ্রার্থী একটি যুবক, মিউনিসিপালিটির কেরাণী মহেশ বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেরই বদিবাবুর সহিত প্রয়োজন।

প্রকাশবাবু সেদিনই চার্জ্জ দিলেন। সমস্তই এমন এলোমেলো ও

অগোছালো অবস্থায় ছিল যে, আইনতঃ চার্জ লইতে গেলে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় দিন লাগিত, প্রকাশবাবুও বিপন্ন হইতেন। খাতাপত্রের কিছুই ঠিক ছিল না। বে-আইনী ভাবে কোনক্রমে গোঁজামিল দিয়া বিমল প্রকাশবাবুকে রেহাই দিয়া দিল। প্রকাশবাবু সেই দিনই দুপুরের ট্রেনে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় বিমলকে বলিয়া গেলেন—আমার ঐ নড়বড়ে চৌকিটা আর হাতল-ভাঙা চেয়ার দুটো আপনাকে দান ক'রে গেলাম বিমলবাবু। ওগুলো ভাল কাঁঠাল-কাঠে তৈরি, কব্জাগুলো ঠিক নেই খালি—অর্থাৎ আমার মতো অবস্থা—হা-হা-হা-হা—

বৈকালে চেয়ারম্যান রাখাল নন্দীর সঙ্গেও দেখা হইল। নন্দী মহাশয় নিজের বাগানের একটি ছায়া-শীতল স্থানে শ্বেতপাথরের চৌতারার উপর বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন—অম্বরি তামাকের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। নগ্নগাত্র, ক্ষৌরিকৃত মুখমণ্ডল, ভাষা-ভাষা আরক্ত নয়ন, মাংসল নাকের উপর সূক্ষ্ম একটি তিলক, গলায় কণ্ঠী, দক্ষিণ বাহুমূলে মাদুলি, মেদবহুল অতিপুষ্টদেহ নন্দী মহাশয় গরমে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন! পিছনে দুই জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া প্রাণ-পণে হাওয়া করিতেছিল। বিমলের সঙ্গে পরেশ-দাও গিয়াছিলেন। পরিচয় দিতেই অর্থাৎ বিমল চাটুজ্যে ব্রাহ্মণ-সন্তান এই বোধ মনে স্পষ্টভাবে জাগরূক হইতেই নন্দী মহাশয় শরীরের গুরুভার সত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন এবং বেশ একটু ঝুঁকিয়া বিমলকে নমস্কার করিলেন। পরেশ-দা বলিলেন—বসুন, বসুন, আপনি বসুন!

—ওরে দুখানা চেয়ার নিয়ে আয় শীগ্‌গির—ব্রাহ্মণ-সন্তান দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনারা আর আমি বসব, সে কি একটা কথা হ'ল!

নন্দী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেশীক্ষণ অবশ্য তাঁহাকে

দাঁড়াইতে হইল না,—দুইখানি চেয়ার শীঘ্রই আসিয়া পড়িল এবং সকলে উপবেশন করিলেন।

নন্দী মহাশয় পুনরায় আদেশ করিলেন—ডাব নিয়ে আয়, বরফ দিয়ে আনিস।

পরেশ-দা বলিলেন—আপনার বাড়ীতে বরফ!

নন্দী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের জন্যে রাখতে হয়, আমার মত সকলেই ত আর বাতুল নয়!

পরেশ-দা বলিলেন—আপনি খান না তা শুনেছি।

গড়গড়ার নলে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আমার কেমন যেন প্রবৃত্তি হয় না! সংস্কার ব'লে ত একটা জিনিষ আছে—

কিছুক্ষণ তামাকে টান দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—খাব, আগে আমরা ইলেকট্রিসিটিটা এনে ফেলি, নিজের বাড়ীতে রেফরিজেরেটারে বরফ বানিয়ে তার পর খাব। দাঁড়ান না,—

পরেশ-দা বলিলেন—ইলেকট্রিসিটি হবে না কি টাউনে?

—চেষ্টা তো করছি, একটা স্কীমও খাড়া করেছি, বাগড়া দিচ্ছেন আমাদের মথুরবাবু—লোকটিকে ত জানেন—অরগুণ নেই বরগুণ আছে—

পুনরায় গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন।

আবার সহসা বলিলেন—ইলেকট্রিসিটি না হ'লে এই দারুণ গ্রীষ্মে কি কষ্ট বলুন তো—এই চাকর দুটো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তবু দেহ শীতল হচ্ছে না! ওদেরও তো কষ্ট হয়।

আবার কিছুক্ষণ গড়গড়ায় টান দিলেন। তাহার পর সহসা বিমলের

দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আপনাদের হাসপাতালেও ত ইলেকট্রিক হ'লে সুবিধে হয়।

বিমল বলিল—তা হয় বইকি!

নন্দী মহাশয় পুনরায় তাম্রকূটে মন দিলেন। সেদিন রাত্রে ডিট্‌জ লণ্টন ধরিয়া অপারেশনের কথাটা বিমলের মনে পড়াতে সে পুনরায় বলিল—ইলেকট্রিসিটি হ'লে খুব সুবিধে হয়। রাত্রে ইমারজেন্সি অপারেশন ইলেকট্রিসিটি না থাকলে হওয়া অসম্ভব।

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতেছিলেন। তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন—ঐ পয়েণ্টটা টুকে দেবেন ত আমাকে—

হঠাৎ এই পয়েণ্টটা টুকিয়া লইয়া কি হইবে বিমল ঠিক বুঝিল না, তথাপি বলিল—আচ্ছা।

ডাব আসিল। দুই-চারি কথার পর পরেশ-দা ও বিমল গাত্রোত্থান করিলেন। আসিবার প্রাক্কালে নন্দী মহাশয় বলিলেন—হাসপাতালটার বড় বদনাম হয়ে গেছে মশাই আগের ডাক্তারের আমলে। আপনি একটু সামলেসুমলে নিন আবার!

—আচ্ছা

জগদীশ বাবু ডাক্তারের সহিতও আলাপ হইল।

লোকটি অতিশয় মিষ্টভাষী। দেখিয়া মনে হয় তিনি কখনও কাহারও মনে ব্যথা দিতে পারেন না। কাহারও কথার প্রতিবাদ করা, এমন কি ইঙ্গিতেও কাহারও মনে আঘাত দেওয়া যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মুখে হাসি সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। সামনের দিকে নীচে গোটা দুই দাঁত নাই, হাসির ফাঁকে ফাঁকে ফোকলা দাঁতের ভিতর দিয়া লাল টুকটুকে জিবের ডগাটি প্রায়ই দেখা যাইতেছে। বিমলের পরিচয় পাইয়া

একমুখ হাসিয়া বলিলেন—আসুন আসুন—আপনার কথাই হচ্ছিল একটু আগে! থামুন এই কটা সেরে নিই, তার পর কথা কইছি আপনার সঙ্গে—সমবেত কয়েক জন রোগী-রোগিণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—আসুন আপনারা ঘরের ভেতর—

পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—আমার ডাকের সময় হ'ল, আমি চললাম, হরেন বেচারা একা সামলাতে পারবে না। তুমি আলাপ-টালাপ ক'রে এস—বুঝলে?

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল একা বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে জগদীশবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোকরা বলিতে বলিতে বাহির হইল—তেতো ওষুধ আমার বউ খেতে পারবে না ডাক্তারবাবু, এ ওষুধটা মিষ্টি হবে ত?

জগদীশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার পানে এক বার চাহিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটুকু বারদুই উঁকি দিয়া গেল। বলিলেন—আমি তোমার বউকে চিনি না? ঠিক ওষুধ দিয়েছি। আজ দেখো, ঠিক খাবে—

ছোকরা পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল। জগদীশবাবু সস্মিত মুখে বিমলের দিকে চাহিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—এলাম আপনাদের আশ্রয়ে—

জগদীশবাবু কিছু না বলিয়া তেমনই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল—দেখছেন কি অমন ক'রে?

জগদীশবাবু বলিলেন—আশ্চর্য্য চওড়া ত আপনার কপাল!—

তাহার পরই তাঁহার মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিব উঁকি মারিতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত বিমলকে কপাল লইয়া কেহ প্রশংসা করে নাই। সে হাসিয়া বলিল—এ-কথা আর তো কখনো শুনি নি!

জগদীশবাবু বলিলেন—আমি বলছি, খুব চওড়া কপাল আপনার—

বিমল কি বলিবে চুপ করিয়া রহিল। জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন লাগছে জায়গটা?

—মন্দ কি।

—হাসপাতাল কেমন দেখলেন?

—এখনও দেখবার সময় পাই নি, চার্জ্জ নিতেই আজ সমস্ত সকালটা গেল। কাল থেকে দেখা যাবে ভাল ক'রে। আজ বিকালটা আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতেই কাটল—

—বেশ, বেশ—ভূধরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, কে তিনি?

—তিনি আমাদেরই এক জন—এখানেই প্র্যাকটিস্ করেন। বাজারের ভিতর তাঁর ডিসপেন্সারি।

বিমল প্রশ্ন করিল—এখানে ফিল্ড্ কেমন?

—ঐ কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায় আর কি আমাদের ক-জনের! এবার উঠতে হবে আমাকে, তিনটে কল বাকী আছে এখনও—

জগদীশবাবু উঠিতেছিলেন, বিমলও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন সময় একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম্পশু, সাবান দেওয়ার জন্য

মাথার চুল উস্কোখুস্কো, হাতের আঙুলে দামী পাথর-বসানো আংটি। বেশ সভ্যভব্য সুন্দর চেহারা।

—আসুন, আসুন অমরবাবু, তার পর খবর কি, কেমন আছেন—

বিমল অমরকে এখানে দেখিবে প্রত্যাশা করে নাই। সে সবিস্ময়ে বলিল—অমর তুই এখানে!

অমর বলিল—বিমল যে, আরে তুই কোথা থেকে?

—আমি যে এখানকার হাসপাতালে ডাক্তার হয়ে এসেছি!

—তাই না কি,—যাক বাঁচা গেল! তোরই কথা ভাবছিলাম আজ ক'দিন থেকে!

তাহার পর জগদীশবাবুর দিকে ফিরিয়া অমর বলিল—এ আমার অনেক দিনের বন্ধু, ম্যাট্রিক, আই-এস্‌সি সব একসঙ্গে পড়েছি। ও মেডিকেল কলেজে ঢুকল, আমি জেনারেল লাইনেই থেকে গেলাম। তুই এখানে এসেছিস।

বিমল বলিল—তুই এখানে এলি কোথা থেকে?

—কি মুশ্‌কিল, এইখানেই যে আমাদের বাড়ী—ওপারে।

বিমল জানিত অমর কোন বড়লোক জমিদারের পুত্র কিন্তু এই-খানেই যে তাহার বাড়ী তাহা সে এই প্রথম শুনিল। জগদীশবাবু প্রশ্ন করিলেন—মথুরবাবু আছেন কেমন?

অমর হাসিয়া বলিল—বাবার কথা আর বলবেন না, আমেরিকা থেকে কি এক ওষুধ আনিয়েছেন তাই খাচ্ছেন আমার ওষুধটা বদলাবেন না কি?

জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন আছেন আপনি?

—সামান্য একটু ভাল।

—ওই তবে চলুক।

—চল গঙ্গার ধারে একটু বসা যাক কোথাও—

জগদীশবাবুকে নমস্কার করিতে গিয়া বিমল সহসা লক্ষ্য করিল তাঁহার মুখের হাসিটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটা নড়িতেছে না।

বাহির হইয়া বিমল প্রশ্ন করিল—হয়েছে কি তোর?

কথাটা শুনিয়া কেমন অপ্রতিভ হইয়া আমর বলিল—চল্ সব বলছি—তুই এসেছিস ভাল হয়েছে।

নিকটেই গঙ্গার ধারে একটা নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া উভয়ে উপবেশন করিল। দামী সিগারেট-কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বিমলকে একটি দিয়া নিজে একটি ধরাইতে ধরাইতে অমর বলিল—সব কথা খুলে বলছি তোকে, কিন্তু ভাই কিছুতে যেন প্রকাশ না হয়। এক ফোকলা ছাড়া আর কেউ জানে না—

বিমল একটু হাসিল, অমর বলিতে লাগিল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, বিমল এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। বড়লোকের ছেলেদের পদস্খলনের সেই সনাতন কাহিনী। সঙ্গদোষে পড়িয়া পদস্খলন, সংক্রামক ব্যাধি, মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য আজীবন মনস্তাপ এবং জলের মত অর্থব্যয়। ডাক্তারি পড়িতে পড়িতে এরূপ অনেক কাহিনীই সে শুনিয়াছে! কাহিনী শেষ করিয়া অমর বলিল—মুশ্‌কিল হয়েছে ভাই এখন বিন্নুকে নিয়ে।

—বিন্নু কে?

—সব ভুলে গেছিস দেখ্‌ছি। লরেটোর বিন্নুকে ভুলে গেলি?

—তাকে বিয়ে করেছিস নাকি?

হঁ্যা।

—শুনেছিলাম তোর বাবা-মা'র অমত আছে, বিয়ে হবে না—

—তাঁদের অমতেই লুকিয়ে বিয়ে করেছিলুম সে অনেক কাণ্ড, তার পর বাবা-মা সব ক্ষমা করেছেন; বিনু এখন আইডিয়াল হিন্দু বধূ, টিপিকাল গৃহলক্ষ্মী যাকে বলে, ব্রত উপোস, পূজো-মানত ধূপধুনো গঙ্গা-জল গোবরজল নিয়ে বিনু সকলের উপরে টেক্কা দিয়েছে! মা-বাবা বউমা বলতে অজ্ঞান! কিন্তু আমি ভাই মহা মুশকিলে পড়েছি! বিনু ঘূর্ণাক্ষরে একথা জানে না এখনও!

বিমল বলিল—তার মানে?

—মানে, ভণ্ডামি করছি। বিনুর কাছে 'পোজ' করেছি আমি কোন সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়েছি এবং গুরুর আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য পালন করছি। তুই ভাই একটা উপায় বলে দে আমাকে—অনেষ্ট ওপিনিয়ন চাই।

বিমল বলিল—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

অমর প্রশ্ন করিল—তুই বিয়ে করিস নি এখনও?

—করেছি বইকি।

—বউ কোথা?

—পড়ছে—এবার তার আই-এ পরীক্ষা।

—তার মানে, কি নাগাদ আসবে এখানে?

—পরীক্ষা হয়ে গেলেই—হচ্ছে পরীক্ষা—

—বিনুর সঙ্গে তাহলে জমবে ভাল, এ-অঞ্চলে কলেজেপড়া মেয়ে আর একটিও নেই—

বিমল হাসিয়া বলিল—ভালই হবে। কত দূর তোর বাড়ী এখান থেকে—

—ওপারে, যাস এক দিন—কালই আয় না। ফেরি ঘাটে পেরিয়ে

মথুরবাবুর বাড়ী কোন্ দিকে বললেই দেখিয়ে দেবে সবাই। কোন্ সময় আস্‌বি?

—কাল বিকেলের দিকে চেষ্টা করব। চল্ এখন ওঠা যাক্। তুই সকালে হাসপাতালে আসিস না?

—আচ্ছা।

সেদিন রাত্রে বিমল মণিমালাকে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিল। মনের আবেগ ভবিষ্যৎ জীবনের মনোরম একটি চিত্র আঁকিয়া দিল। হাসপাতালের বর্ণনা, তাহার প্রথম রোগী সেই বুড়িটার বর্ণনা, পরেশ-দার অতিথি-পরায়ণতা, অমর ও অমরের স্ত্রীর কথা, নন্দী মহাশয়, জগদীশবাবু, বদিবাবু, গুপি কাম্পাউণ্ডার, হাসপাতালের অ্যাপ্রেন্টীস ড্রেসার ভুলু, ভৈরব চাকর, শিবু ঠাকুর, জানকী মেথর, এমন কি রুক্মি মেথরাণীর কথা পর্য্যন্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া অবশেষে বিমল লিখিল —আমার জীবনের পথে তুমিই সঙ্গিনী, তুমি না এলে কিছুই ভাল লাগছে না!

পরেশ-দা আসিয়া বলিলেন—আর এক তা কাগজ দেবে? উঃ একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের চার পিট ভরিয়ে ফেললে যে হে তুমি!

বিমল হাসিয়া বলিল—ক্যাশ মিলল আপনার?

—মিলেছে, যোগে ভুল হচ্ছিল।

—চলুন আমার হয়ে গেছে!

উভয়ে গিয়া খাইতে বসিল। পিওন হরেনই রাঁধিয়াছে আজ।

৪

তাহার পরদিন সকাল হইতে-না-হইতেই বিমল হাসপাতালে গিয়া হাজির হইল। সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে, সাতটা হইতে হাসপাতালের কাজকর্ম্ম আরম্ভ হওয়ার কথা। বিমল গিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল জানকী ঘর ঝাড়ু দিতেছে। বিমল প্রথমেই গিয়া বুড়িটাকে দেখিল, বুড়ী ভাল আছে। তাহার পর কালাজ্বর রোগীটাকে সে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, ইহার রক্ত, মলমূত্র সমস্তই পরীক্ষা করা দরকার, তাহার তো নিজেরই মাইক্রস্‌কোপ আছে, সহজেই করিতে পারিবে। জানকীকে ইহার মলমূত্র রাখিতে আদেশ করিল।

—তোমার কি কষ্ট হয়?

—আমার পেটটা বড্ড ব্যথা করে বাবু, পিলেটা কামড়ায় বড্ড।

—সেই জন্মে বুঝি সন্ধ্যের সময় চেঁচাচ্ছিলে সেদিন।

—না, চেঁচাই না তো কোন দিন আমি, জানকীকে জিজ্ঞেস করুন আপনি। পিলেটা বড্ড কামড়ায় থেকে থেকে, তাই একটু উঁ আঁ করি।

—আচ্ছা, সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি তোমার, ভাল হয়ে যাবে।

—আমার পেটের ব্যথার একটুকু ভাল ওষুধ দিন বাবু—

—আচ্ছা।

দ্বারপ্রান্তে ফুলু—অ্যাপ্রেণ্টিস্‌ ড্রেসার—আসিয়া দর্শন দিল এবং বিমলকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ফুলু আঠার-উনিশ বছরের ছোকরা, শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ একটা বিনীত অথচ সুপ্রতিভ ভাব। প্রথম দিন দেখিয়াই বিমলের ইহাকে ভাল লাগিয়াছিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—কম্পাউণ্ডার বাবু কোথা?

—গঙ্গা নাইতে গেছেন।

—তাঁকে খবর পাঠাও, সাতটা তো বাজে! ঠিক সময় কাজ আরম্ভ করতে হবে!

ডুলু বলিল—আচ্ছা।

সে বাহিরে চলিয়া গেল এবং সম্ভবতঃ কম্পাউণ্ডার বাবুর বাসাতেই গেল।

বিমল হাসপাতালটা আর একবার ভাল করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। ছোটখাট হাসপাতালটি বেশ সুন্দর।

সাতটার সময় কাজ আরম্ভ হইল না। গুপিবাবু ঠিক সময়ে আসিয়া পৌছিতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গাস্নানাদি সারিয়া টিকিতে ফুল বাঁধিয়া ও কপালে চন্দনের তিলক কাটিয়া যখন হাজির হইলেন তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

বিমল মনে মনে চটিয়াছিল, তথাপি ভদ্রভাবেই বলিল—বড্ড দেরি হয়ে গেল আপনার। কাল থেকে কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে হবে।

গুপিবাবু তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চশমার কাচের উপর দিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না, হাসপাতালের রেজিষ্টারখানা লইয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া রুল টানিতে লাগিলেন। বারান্দায় ডুলু জানকীর সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ পাকাইতেছিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—এখানে ন-টার আগে কোন রুগীই আসে না।

বিমল দৃঢ়স্বরে বলিল—রুগী আসুক না-আসুক, সকালে সাতটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত, আর বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত হাসপাতাল খুলে রাখতে হবে।

গুপিবাবু রুল টানিতে টানিতে চশমার ফাঁক দিয়া আর একবার বিমলের মুখের পানে চাহিলেন, কিছু বলিলেন না।

বিমল নীরবে বসিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধ্বংস করিল এবং তারপর উঠিয়া নিজেই বুড়ীর ঘা-টা ড্রেস করিল। সত্যই ন-টার আগে কোন রোগী আসিল না। যাহারা আসিল, তাহারাও অতিশয় বাজে রোগী। দাদ, খোস, কানে পুঁজ, কয়েকটা ম্যালেরিয়া—অতিশয় সাধারণ রকম জনপনর দীন দরিদ্র রোগী। বিমল তাহাদেরই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রেসক্রপশন দেখিয়া গুপিবাবু অবাক হইলেন। এসব ঔষধ হাসপাতালে থাকে নাকি! বিমলকে কয়েক বারই প্রেসক্রপশন পরিবর্ত্তন করিতে হইল। সে মনে মনে দমিয়া গেল। ঔষধ না থাকিলে চিকিৎসা করিবে কিরূপে! সে হাসপাতালের ঔষধের ষ্টক্-বহিটা লইয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল, কিছুই ঔষধ নাই। অসাধারণ ঔষধের কথা দূরে থাক, অতি সাধারণ ঔষধই নাই। কুইনাইনই যৎসামান্য আছে। প্রকাশবাবুর একটা কথা মনে পড়িল—থাকুন এখানে কিছুদিন, সব বুঝতে পারবেন ক্রমশঃ। আপনি অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছেন, আপনাকে হতাশ ক'রে দিতে চাই না!

একটু পরে কিন্তু আরও হতাশ হইতে হইল। হাসপাতালের সেক্রেটারির নামে বি. কে. পালের এক চিঠি আসিল। চিঠির মর্ম্ম এই যে, হাসপাতালের নিকট বি. কে. পালের এখনও প্রায় পাঁচ শত টাকা পাওনা আছে, তাহা যেন অবিলম্বে শোধ করিয়া দেওয়া হয়। বিমল সত্যই অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। যে-হাসপাতালের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয়, যেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ পর্য্যন্ত নাই, সেখানে সে ডাক্তারি করিবে কি লইয়া? টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল। বিমল প্রত্যাশা করিয়াছিল অমর আসিবে, কিন্তু আসিল না। সে উঠিতে যাইবে, এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে একটি লোক আসিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু, নন্দী মশায় ডাকছেন আপনাকে এক বার।

—কেন ?

—তাঁর বাড়ীতে ডেলিভারি কেস্ আছে, লেডী ডাক্তার এসেছেন, ভূধরবাবু এসেছেন, জগদীশবাবুকে পেলাম না, আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।

—চলুন।

বিমল গিয়া দেখিল নন্দী মহাশয়কে দুই জন ভৃত্য পূর্ব্ববৎ বাতাস করিয়া চলিয়াছে। তিনি ঘরের মধ্যে চৌকিতে একটি শীতলপাটির উপর উপবেশন করিয়া ক্রমাগত ঘামিতেছেন। নিকটে ভূধরবাবুও বসিয়াছিলেন। ভূধরবাবুকে বিমল ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই, নন্দী মহাশয় পরিচয় করিয়া দিলেন। বিমল দেখিল, ভূধরবাবুর বয়স খুব বেশী নয়, খুব ফরসা রং, বেঁটেখাটো মানুষটি, দেখিলেই কেমন যেন দাম্ভিক বলিয়া মনে হয়। নাসারন্ধ্র সর্ব্বদাই যেন স্ফীত, ভ্রূযুগল সর্ব্বদাই যেন ঈষৎ উত্তোলিত, অধরে কেমন যেন একটা ব্যাঙ্গ-তিক্ত হাস্য। অদূরে আর একটি চেয়ারে প্রৌঢ়া লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিকও বসিয়া আছেন। বিমল তাঁহাকেও নমস্কার করিয়া আর একটি চেয়ারে বসিল।

নন্দী মহাশয় বলিলেন—জগদীশবাবু এসে পড়লেও বেশ হ'ত !

—জগদীশবাবুকে পাওয়াই মুশকিল, তাঁর নাইবার-খাবার অবসর নেই।

ভূধরবাবু বলিলেন—নাইবার-খাবার আমারও অবসর নেই ! কিন্তু আপনার বাড়ীতে অসুখের খবর পেয়ে আসতেই হ'ল ! ওপারে দু-দুটো আর্জেন্ট কেস ব'সে আছে আমার জন্যে, তাছাড়া এই দেখুন না—

ভূধরবাবু পকেট হইতে একটা ফর্দ্দ বাহির করিয়া গণিতে লাগিলেন, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এটা না হয় ও-বেলা গেলেও চলবে, ছয় সাত ; আট—এটা তো এ-বেলা যেতেই হবে—নয়—দশ—

বিমলের কেমন অস্বস্তি হইতে লাগিল, বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিত ইহা আর কিছু নয় হিংসা।

বিমল নির্ব্বিকার হইবার ভান করিয়া বলিল—পেনটা হচ্ছে কতক্ষণ থেকে—

নন্দী মহাশয় বলিলেন—ঘিনঘিনে ব্যথা কাল সকাল থেকে হচ্ছে, মেয়েরা বলছে জিরেন ব্যথা, আপনারা দেখুন।

ভূধরবাবু বলিলেন—ফরসেপস্ দিয়ে টেনে বের ক'রে দিলেই চুকে যায়, অনর্থক কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলে কি! তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী ফরসেপ্স্ তো শেষ উপায়। ফরসেপ্স্ দেওয়ার হাঙ্গামা তো আছেই, বিপদও কম নয়।

সে বলিল—আমার মনে হয় ঘুমের একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক প্রথমে। এইটেই কি প্রথম বার?

নন্দী মহাশয় বলিলেন—না এটি তৃতীয়।

—এর আগের দু-বার ত কোন গোলমাল হয় নি?

—না।

ভূধরবাবুর দিকে চাহিয়া বিমল বলিল—একটা ব্রোমাইড মিকশ্চার দিয়ে দেখা হয়েছে কি?

ভূধববাবু একটু বিচিত্র রকমের হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমি কি সেকথা ভাবি নি ভাবছেন? এসেই এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়েছি আমি! এঁদের আবার বৈষ্ণবী ধাত কি না?

বিমল হাসিয়া কহিল—ও তাই নাকি,—কিন্তু ব্রোমাইডে ত কোন আমিষ নেই—

লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিক এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। তিনি

বলিলেন—ব্রোমাইড দিয়ে দেখতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় ফরসেপ্‌স দিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত !

বিমল বলিল—দেখা যাক্ না, ডাইলেটেশন কত দূর হয়েছে ?

মিসেস্ মল্লিক বলিলেন—তা প্রায় পুরো হয়ে গেছে।

নন্দী মহাশয় চুপ করিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন—জীবনের কোন আশঙ্কা নেই ত ?

মিসেস্ মল্লিকই রোগী পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বলিলেন—না সে কোন ভয় নেই !

—তাহলে আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু যা বলছেন তাই দিয়েই দেখা যাক না, ফরসেপ-মরসেফ আসুরিক ব্যাপার পরেই হবে না-হয়, যদি দরকার হয়। আপনি বিমলবাবু যান একবার দেখে আসুন নাড়ীটা। ভূধরবাবু আপনিও আর একবার যান—ভূধরবাবুর সহিত বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল। রোগী দেখিয়া তাহার মত আরও দৃঢ় হইল, ফরসেপ্‌স্ দেওয়া উচিত নয়। বাহিরে আসিয়া সে ব্রোমাইডেরই ব্যবস্থা করিল এবং নন্দী মহাশয়ও সেদিকে ঝুঁকিয়াছেন দেখিয়া ভূধরবাবুও তাহা সমর্থন করিলেন। লেডী ডাক্তার যদিও মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ফরসেপ্‌স্ লাগানো হইলে অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশেক টাকা তাঁহার প্রাপ্য হইত। পঞ্চাশ টাকার বদলে মাত্র চারটি টাকা লইয়া তাঁহাতে আপাততঃ উঠিতে হইল। লেডী ডাক্তার চলিয়া গেলে ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল লক্ষ্য করিল, ভূধরবাবু ফীর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুলিলেন না। বিমল যখন উঠিতে যাইতেছে, নন্দী মহাশয় মুখে একটা বিনীত ভাব ফুটাইয়া বলিলেন—আপনার দক্ষিণেটা কত বলুন, আনিয়ে দি—

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক সে পরে হবে এখন—

এক মুখ হাসিয়া নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিলেন।

বিমল চলিয়া যাইবার একটু পরেই ব্যস্তসমস্তভাবে জগদীশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—শুনলাম নাকি রমেনের স্ত্রীর কাল থেকে বড় কষ্ট হচ্ছে!

নন্দী মহাশয় বলিলেন—হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে বৌমার, আপনি এলেন বাঁচলাম। দু-দুবার লোক পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে। লেডী ডাক্তার, ভূধরবাবু আর আমাদের হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু, সব এসেছিলেন। লেডী ডাক্তার আর ভূধরবাবু ফরসেপ লাগাতে চাইছিলেন, নতুন ডাক্তারবাবু বললেন আগে একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক, এই লিখে দিয়ে গেছেন তিনি দেখুন—

নন্দী মহাশয় বিমলের প্রেস্‌ক্রপশনটি জগদীশবাবুকে দিলেন।

জগদীশবাবু প্রেস্‌ক্রপশনটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেখিলেন ও গম্ভীর ভাবেই ফেরত দিলেন।

নন্দী মহাশয় পিছনের ভৃত্যদ্বয়কে ধমক দিলেন—ঢুলছিস নাকি ব্যাটারা, জোরে বাতাস কর—জগদীশবাবু এই এইখানটায় বসুন আপনি হাওয়া পাবেন, তার পর কি রকম দেখলেন প্রেস্‌ক্রপশনটা—

—আমাদের কেতাব-কোরাণ অনুসারে ঠিকই। তবে বউমার ধাত আমি চিনি কি না, তাই এই ওষুধটার ডোজটা আমি একটু কমিয়ে দিতে চাই।

—দিন।

জগদীশবাবু ব্রোমাইডের ডোজটা একটু কমাইয়া দিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ফোকলা দাঁতের

ফাঁকে জিবটা উঁকি মারিতে লাগিল।—বুড়ো মানুষের একটা কথা শুনবেন?

—কি বলুন।

—চণ্ডীতলা থেকে একটু মাটি নিয়ে এসে পানাপুকুরের জলের সঙ্গে গুলে পেটে বেশ ক'রে একটি প্রলেপ দিইয়ে দিন। বড় বড় লেবার কেস যেখানে কিছুতে হালে পানি মেলে না, সেখানে ঐ চণ্ডীতলার মাটি মুখ রক্ষে করেছে! ওষুধটা চলুক, কিন্তু প্রলেপটাও দিন।

চণ্ডীতলার মাটি আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিল।

৫

কয়েক দিন হইল বিমল নিজের বাসায় আসিয়াছে। নিজের আলাদা একটি চাকরও রাখিয়াছে, কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড, রান্নাবান্না হইতে সুরু করিয়া সব কাজকর্ম্মই সে নিপুণভাবে করে। পরেশ-দাই চাকরটি জোগাড় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পিওন হরেনের ভাই যোগেন। সনাতন রীতি, হাসপাতালের চাকরই ডাক্তারবাবুর বাসায় কাজ করিয়া থাকে। এই সনাতন রীতির ব্যতিক্রম হওয়াতে হাসপাতালের চাকর ভৈরব মনে মনে যৎপরোনাস্তি চটিয়াছিল। এত দিন ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কাজ করার ওজুহাতে সে হাসপাতালের কাজে ফাঁকি দিত, ডাক্তারবাবুর বাজার-হাট করিয়া দিয়া দুই পয়সা উপরি রোজগার করিত, ডাক্তারবাবুর নিকট কিছু বেতনও পাইত। এই অদ্ভুত ধরণের নতুন ছোকরা ডাক্তারবাবুটি আসাতে সমস্তই ওলটপালট হইয়া গেল। সে বিমলের নামে সুযোগ পাইলেই গোপনে একটু-আধটু নিন্দা করিতে লাগিল। কম্পাউণ্ডার গুপিবাবুও চটিয়াছিলেন। বিমলের কড়া হুকুম অনুসারে তাঁহাকে ঠিক ঠিক সময়ে হাসপাতালে 'হাজির হইতে হইতেছিল। এ তো বিপদ কম নয়! হাসপাতালে রোগী

ঔষধ কিছু নাই, শুধু সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করা। সকালবেলায় গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা-আহ্নিকটা কোনক্রমে নমোনমো করিয়া সারিয়া ফেলিতে হয়, বৈকালে ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাগ্দী-পাড়ায়, কুলি-পাড়ায়, মুসলমান-পাড়ায় ঘুরিয়া চার আনা আট আনা দক্ষিণা লইয়া একটু-আধটু প্র্যাকটিস তিনি করিতেন—তাঁহাকে দুই-চারি আনা পয়সা দিলে হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ ভাল করিয়া 'মন দিয়া' তিনি প্রস্তুত করিয়া দিবেন এই ভরসায় অনেক গরিব লোকই তাঁহাকে ডাকিত— 'সেদিনকার ছোঁড়া' এই ডাক্তারটা আসিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়কে বলিয়া ইহার একটা বিহিত করার প্রয়োজন গুপিবাবু অনুভব করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় হাসপাতাল-কমিটির এক জন মেম্বার তো বটেনই, অন্যান্য মেম্বারদের উপরও তাঁহার আধিপত্য আছে। ধনী মহাজন তিনি অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখেন। বদিবাবুর মতন 'দুঁদে' লোকও চৌধুরীকে চটাইতে সাহস করেন না। নানাকারণে চৌধুরী মহাশয় গুপিবাবুর উপর প্রসন্ন। গুপিবাবু তাঁহার বাড়ীর পুরোহিত, অসুখ-বিসুখ করিলে নার্স, প্রতি সন্ধ্যায় পাশাখেলার সহচর এবং সর্ব্বোপরি সুদক্ষ মোসাহেব। সুতরাং কম্পাউণ্ডার হইলেও গুপিবাবু নিতান্ত অক্ষম লোক নহেন, ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই তিনি করিতে পারেন। অনেক ডাক্তার তিনি চরাইয়াছেন! বিমল যদিও মনে মনে গুপিবাবুর বিরুদ্ধভাবটা অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সেজন্য তাহার বিশেষ চিন্তা ছিল না। সে সেদিন সন্ধ্যায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল কি করিয়া হাসপাতালে কিছু ঔষধ জোগাড় করা যায়। ঔষধ না থাকিলে সে চিকিৎসা করিবে কি দিয়া। নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে সেদিন যে প্রেস্ক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল তাহাতেই কাজ হইয়াছে,

ফরসেপস্ লাগাইতে হয় নাই। জগদীশবাবুর চণ্ডীতলার মাটি এবং ভূধরবাবুর হোমিওপ্যাথির ফোঁটা যে তাহার কৃতিত্বের খানিকটা হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। চণ্ডীতলার মাটির কথা সে শোনেই নাই। তাহার মনে হইল নন্দী মহাশয়ের নিকট গিয়া হাসপাতালের দুরবস্থার কথা খুলিয়া বলিলে হয়তো তিনি কোন ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। সে উঠিয়া পড়িল। পরেশ-দাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এখনই একবার গেলে হয়। কাল সমস্ত দিন হাসপাতালের কাজেকর্মে অবসর পাওয়া যাইবে না। পোস্টাফিসে গিয়া দেখিল পরেশ-দা নাই, তিনি সারস্বত মন্দিরের মাসিক অধিবেশনে গিয়াছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নাই। বিমল একাই নন্দী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

—আসুন আসুন ডাক্তারবাবু!

নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিয়া বিমলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বিমল উপবেশন করিয়া বলিল—রমেনবাবুর স্ত্রী ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর কোন গোলমাল হয় নি, বেশ ভাল আছে।

ইহার পরই বিমল মনে মনে প্রত্যাশা করিতেছিল যে নন্দী মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—চা আনতে বলব, না সরবত?

—চা-ই আনতে বলুন।

চায়ের ফরমাস দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—এই নিদারুণ গ্রীষ্মে

কি করে যে আপনারা চা খান তাই আমি ভাবি। আমার রমেনেরও ঐ, সকাল-বিকেল চা চাই—

চা-পানান্তে বিমল আসল কথাটা খুলিয়া বলিল। সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া নন্দী মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

—তাই নাকি? এই রকম অবস্থা হাসপাতালের?

—একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমি।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আপনার আগে যে ডাক্তারটি ছিলেন অত্যন্ত চণ্ডাল লোক ছিলেন তিনি মশাই, শুনতাম ঘরে ব'সে ব'সে ব্যাঙ-খরগোস চিরতেন, জ্যান্ত ধরে ধরে চিরতেন—এদিকে হাসপাতাল একেবারে দেখতেন না, তিনিই ডুবিয়ে গেছেন হাসপাতালটাকে সম্পূর্ণরূপে—

বিমল বলিল—কিন্তু তিনি বিদ্বান্ লোক ছিলেন।

—যে বিদ্যেতে জীবে দয়া করার প্রবৃত্তি লোপ পায় তেমন বিদ্যে শেখার প্রয়োজনটা কি তাই আমাকে বুঝিয়ে বলুন!

বিমল বুঝিল, নন্দী মহাশয়কে বুঝানো অসম্ভব। সে চেষ্টা সে করিল না, মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। নন্দী মহাশয় গড়গড়ার নলে চক্ষু বুজিয়া টান দিতে দিতে বলিলেন—জীবে দয়াটাই হ'ল গিয়ে পরম ধর্ম্ম, সব শিক্ষার মূল কথা।

বিমল বলিল—তা ত ঠিকই! হাসপাতালের গরিব রোগীগুলোকে দেখলে কষ্ট হয়, বিশেষতঃ তাদের যখন একটু ভাল ওষুধ দিতে পারি না, তখন সত্যি বলছি বড় খারাপ লাগে! আপনার দয়ায় হাসপাতালের ইনডোর রুগীগুলো তবু খেতে পায়—

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

বিমল বলিতে লাগিল—কিন্তু ওষুধটা না থাকলে চিকিৎসা করব কি দিয়ে, এমন কি কুইনিন পর্য্যন্ত নেই—

নন্দী মহাশয় চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—ওটা তো শুনেছি ভয়ানক পয়জন, ওটা যত কম খায় লোকে ততই ভাল! ঐ কুইনিন খেয়েই দেশের লোকগুলো আরও জরাজীর্ণ হয়ে গেল মশাই যাই বলুন আপনারা!

বিমল নন্দী মহাশয়ের ধাত বুঝিয়াছিল, কিছু বলিল না।

কানে-কলম-গোঁজা প্রৌঢ় এক ব্যক্তি একটি খেরোর খাতা হস্তে প্রবেশ করিলেন।এবং সবিনয়ে বলিলেন—চরণ ঘোষের খাজনাটার সুদটা কি—

নন্দী মহাশয় অধীর ভাবে উত্তর দিলেন—কত বার বলব এক কথা! বাপ-পিতামহের বিষয়টা কি উড়িয়ে দিতে বল আমাকে দানছত্তর ক'রে!

কানে-কলম-গোঁজা ব্যক্তি নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যেন কিছুই হয় নাই, নন্দী মহাশয় পুনরায় প্রশান্ত ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বেশ, মাথায় রইল আপনার কথাটা, এবারকার মিটিঙে দেখব চেষ্টা ক'রে যদি কিছু করতে পারি। আসল কথা কি জানেন, ট্যাক্স আদায় হয় না। আমাদের যে ঐ ট্যাক্স-কলেক্টারটি আছে অতি হারামজাদা ব্যক্তি সে। লোকের কাছ থেকে দু-চার পয়সা ঘুস-টুস-খায়—একটি পয়সা আদায় করে না। অথচ ওর গায়ে হাত দেবার জো নেই—বদিরাদুর মক্কেলের দালাল উনি।

নন্দী মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন

—বদিবাবুর কানে আবার কথাটা যেন না ওঠে দেখবেন, উনি আমাদের পার্টির লোক, ওঁকে চটানো মুস্কিল !

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল—আমি কাউকে কিছু বলব না।

নন্দী মহাশয় আরও কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন তাহার পর বলিলেন—কত ডিফিকাল্‌টি যে মশায় তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। যাক্ আপনি ভাল লোক যখন এসেছেন ওষুধ-বিষুধের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

আরও দুই-চারি কথার পর বিমল বিদায় লইল। অন্ধকার একটা সরু গলি দিয়া বিমল আসিতেছিল। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। হাসপাতালকে সে যদি ঠিক মত খাড়া করিয়া তুলিতে পারে পসার জমাইতে দেরি হইবে না। ভূধরবাবু এবং জগদীশবাবুর যেরূপ কলের বহর দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'ফিল্‌ড্‌' তো নিতান্ত ছোট বলিয়া মনে হয় না। হঠাৎ একটা উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে কয়েকটি কথা ভাসিয়া আসিয়া বিমলের কানে প্রবেশ করিল। উৎকর্ণ বিমল দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। অচেনা দুই জন লোক ঘরের ভিতর কথা বলিতেছিল।

—হাসপাতালের নূতন ডাক্তারটি ছোকরা হলে কি হয়, ডাক্তার ভাল, একের নম্বর ধড়িবাজ!

—না না, হরেনবাবু ওকথা বলবেন না। স্টেশন থেকে একটা বুড়িকে কুড়িয়ে এনে নিজের পয়সা খরচ ক'রে চিকিৎসা ক'রে ভাল তো করেছে। আপনাদের হাসপাতালে তো ওষুধপত্তর কিছু নেই !

—ওসব চাল মশাই ! এক চালে বাজি মাৎ করবে ভেবেছে, অত সহজে ভোলবার ছেলে হরেন বোস না।

—আমার সঙ্গে অবশ্য এখনও বিশেষ পরিচয় হয় নি, কিন্তু আমার চাকরটা তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে দেখাতে গিছল, খুব যত্ন করে দেখেছে নাকি, খুব সুখ্যাতি করছিল সে।

হরেনবাবু বলিলেন—অতিশয় চালিয়াৎ লোক মশাই, গুপিবাবুর কাছে শুনলাম এমন সব প্রেস্‌ক্রুপ্‌শান করে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। চাল দেখাবার জন্যে নানারকম বিদ্‌ঘুটে ওষুধের প্রেস্‌ক্রুপ্‌শান লেখে। সব বুঝি মশাই।

বিমল আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। এই হরেন বোসই কি তাঁহাদের হাসপাতাল-কমিটির মেম্বার? ইহার কথাই কি পরেশ-দা বলিয়াছিলেন! ভয়ানক লোক তো!

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল স্বয়ং বদিবাবু তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। প্রকাশবাবুর হাতল-ভাঙা চেয়ারটি ভৃত্য যোগেন বারান্দায় বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহারই উপর বদিবাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

—ডাক্তার বাবু নাকি, বেড়িয়ে ফিরলেন বুঝি?

—নন্দী মশায়ের কাছে গিছলাম।

—তার পুত্রবধূটির খবর ভাল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারই ওষুধে দেখলাম উপকার হয়েছে!

—আপনি কি ক'রে দেখলেন?

স্মিতহাস্য করিয়া বদিবাবু বলিলেন—রাজা কর্ণেন পশ্যন্তি! চার দিকে চোখ-কান খুলে রাখতে হয়।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। বদিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন—আপনি কি খুব ক্লান্ত আছেন?

—না, কেন বলুন তো ?

—এক জায়গায় যেতে হবে, একটু দূর আছে।

—বেশ চলুন।

—এখুনি তৈরি ?

—তা নয় তো কি ?

—বাঃ, এই তো চাই, চলুন।

—কতক্ষণ দেরি হবে ?

—ঘণ্টা দুই-আড়াই ওপারে গিয়ে, মোটরে ক'রে মাইল-চারেক। ওপারে সতীশবাবু জমিদার আছেন তাঁদেরই বাড়ীতে।

—কারও অসুখ নাকি ?

—অসুখ আছে এক জনের, সতীশ বাবুর ভায়ের, এ অঞ্চলের সব ডাক্তারই দেখেছেন কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না। প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। তাছাড়া আরও একটা কাজ আছে।

—কি ?

—ওঁদের জমিদারীতে একটা ফৌজদারী হয়ে গেছে : একটা লোক মারাও গেছে, তারই পোষ্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ নাকি পেয়েছেন ওঁরা, তাই আমাকে যেতে লিখেছেন একবার। মোটর পাঠিয়েছেন, আপনাকে দিয়ে রিপোর্টটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই, কি ভাবে জেরা করলে সুবিধে হবে।

—বেশ চলুন। দাঁড়ান, আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে নি।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বদিবাবুকে বলিল—আমাদের হাস-পাতালে ওষুধ কিছু নেই, তার একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনি। এই কথা বলতেই নন্দী মহাশয়ের কাছে গেছলাম আমি।

—কি বললেন তিনি ?

—তিনি বললেন, আগামী মিটিঙে কথাটা পাড়বেন!

—মিটিঙে পেড়ে তো সবই হবে, টাকা কই, ওষুধের দোকানের ধারই এখনও শোধ হয় নি।

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর বদিবাবু প্রশ্ন করিলেন—কত টাকার ওষুধ হ'লে চলে আপনার আপাতত?

—কিছুই তো নেই, শ-পাঁচেকের কম হ'লে কি ক'রে চলবে!

—পাঁচ শ টাকা! বলেন কি মশাই?

—কিছুই ওষুধ নেই যে?

—দেখি।

সতীশবাবুর ভাইকে পরীক্ষা করিয়া তাহার কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হইল।

সতীশবাবু শুনিয়া বলিলেন—সে কি মশাই, কালাজ্বর শুনেছি আসাম অঞ্চলে হয়, কুলিদের।

বিমল হাসিয়া বলিল—আজকাল সর্ব্বত্রই হয়।

—ভদ্রলোকদেরও?

—হঁ্যা।

সতীশবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তাহলে উপায়?

—রক্তটা আজ নিয়ে যাই, পরীক্ষা ক'রে তার পরে ঠিক জানাব।

—রক্ত কি আপনিই পরীক্ষা করবেন? আপনার কি সব যন্ত্রপাতি—

—এর জন্যে যা দরকার তা আমার আছে।

বদিবাবু সস্মিত দৃষ্টিতে সতীশবাবুর দিকে চাহিলেন। বিমলের রক্ত পরীক্ষা করিবার সমস্ত সরঞ্জাম আছে এ কৃতিত্ব যেন তাঁহারই!

সতীশবাবু বলিলেন—সিভিল সার্জন একবার দেখেছিলেন, তিনিও রক্তপরীক্ষার কথা বলেছিলেন, কিন্তু জগদীশবাবু মানা করলেন ব'লে আর হয় নি। বললেন, এমনই শরীরে রক্ত নেই, রক্ত পরীক্ষা ক'রে আবার খানিকটা রক্ত নষ্ট ক'রে লাভ কি? রক্ত নিলে আবার কোন অনিষ্ট-টনিষ্ট হবে না তো? দেখছেন তো কি রকম দুর্ব্বল!

—না, কোন অনিষ্ট হবে না।

বিমলের কথায় যতটা না হউক বদিবাবুর আগ্রহে সতীশবাবু অবশেষে রক্তপরীক্ষা করাইতে রাজি হইলেন।

রক্ত লইবার সময় সমারোহ ব্যাপার পড়িয়া গেল। একজন মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল, সতীশবাবু ও বদিবাবু দুইজনে দুই পাশে দাঁড়াইয়া রোগীকে ভরসা দিতে লাগিলেন, সতীশবাবুর মা পূজার ঘরে গিয়া সভয়ে ঠাকুরদেবতার শরণাপন্ন হইলেন, বাড়ীর কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা উৎসুক হইয়া দ্বারপ্রান্তে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর চাকর-দাসীদের মুখেও একটা সশঙ্ক ভাব ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিমলও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। রোগীর তো কথাই নাই, তিনি চোখ বুজিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নেই সমস্ত হইয়া গেল, কোনরূপ অঘটন ঘটিল না। বিমল রক্ত লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

সতীশবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—একটু দুধ খাইয়ে দেওয়া যাক্, কি বলেন?

—দিন।

—একটু ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দেব তার সঙ্গে?

—ব্র্যাণ্ডি আছে বাড়ীতে?

সতীশবাবু ও বদিবাবুর একটা দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল।

সতীশবাবু বলিলেন—আছে।

—দিন তাহলে এক চামচে।

এ ব্যাপার চুকিয়া গেলে বিমল পোষ্টমর্টেম রিপোর্টখানা আদ্যোপান্ত পড়িল এবং কিভাবে জেরা করিলে বদিবাবুর সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া দিল।

সব চুকিয়া গেলে সতীশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে বিমলকে আহারটাও তাঁহারই বাড়ীতে সমাধা করিতে হইল। সতীশবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, বদিবাবুও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আহার শেষ করিয়া ফিরিতে বিমলের বেশি দেরি হইয়া গেল। বিমল যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। এত রাত্রে বাড়ী আসিয়াও কিন্তু বেচারা ঘুমাইতে পাইল না। আসিয়াই শুনিল হাসপাতালে শক্ত একটা রোগী আসিয়াছে। ভৃত্য যোগেন খবরটি দিল। বিমলকে তখনই আবার হাসপাতালে ছুটিতে হইল।

বাউরিদের একটি বউ আপিং খাইয়াছে।

অল্পবয়সী এই মেয়েটির মনে কি এমন গভীর ধিক্কার হইল যে সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! বিমল যথারীতি সমস্ত ব্যবস্থাই করিল, গলার ভিতর দিয়া রবারের নল চালাইয়া ঔষধ দিয়া সমস্ত পেটটা বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া দিল, একটি ইনজেকশন দিল এবং গুপিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কফি কোথাও পাওয়া যাবে?

—কফি? আজ্ঞে, না।

—কারও বাড়ীতে নেই? ঠিক ঠিক, পরেশ-দার কাছে আছে। এই জানকী, যা তো নিয়ে আয় চেয়ে আমার নাম করে!

জানকী চলিয়া গেল।

বিমল তখন বাউরি-বউয়ের আত্মীয়স্বজনকে (অনেকেই আসিয়াছিল) আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে কেহই কিছু বলিতে চায় না। অনেক জিজ্ঞাসা করার পর একটি বৃদ্ধা চুপি চুপি বলিল যে, দুখীরাম অর্থাৎ ঐ মেয়েটির স্বামীই ইহার জন্য দায়ী। বিবাহ হইবার পর হইতে সে সুন্দরিকে অর্থাৎ ঐ বউটিকে কিছু তো কিনিয়া দেয়ই নাই, উপরন্তু উহার গহনাগুলি সব বিক্রয় করিয়া সেদিন জমিদারের খাজনা এবং কাবুলিওলার ধার শোধ করিয়াছে। বেচারি সুন্দরি লুকাইয়া লুকাইয়া সংসার-খরচের টাকা হইতে জমাইয়া দুইটি টাকা অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিল ইচ্ছা ছিল একটি রঙীন শাড়ী কিনিবে, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় দুখীয়া তাহাও ছিনাইয়া লইয়া গিয়া তাড়ি-মদে সে টাকা দুইটি নিঃশেষ করিয়াছে। সুতরাং সুন্দরি আপিং না খাইয়া করিবে কি? সত্যই তো, শাড়ী কেনার টাকা দিয়া তাড়ি কেনা ভয়ানক অন্যায় কার্য্য। বিমল সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং বলিল যে, কাল দুখীরামকে ডাকাইয়া সে উহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করিবে।

জানকী কফি আনিয়া হাজির করিল। সুন্দরিকে খানিকটা কড়া কফি পান করাইয়া এবং তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার আদেশ দিয়া বিমল বাসায় ফিরিয়া গেল। বাসায় গিয়া দেখিল পরেশ-দা বসিয়া আছেন। হাসিমুখে বলিলেন,—তোমার জ্বালায় তো অস্থির দেখছি, সখ ক'রে এক টিন কফি কিনে রেখেছিলাম, সব শেষ ক'রে দিলে তো?

—না, আছে এখনো খানিকটা।

—এই নাও আজ সন্ধ্যার ডাকে এসেছে—সম্ভবত 'হার ম্যাজেষ্টীজ' চিঠি—ভাবলাম দিয়ে যাই।

বিমল দেখিল সত্যই মণিমালার চিঠি।

—সন্ধ্যাবেলা কোথায় গিছলে? সারস্বত মন্দিরের ফেরত এসেছিলাম একবার।

—একটা কলে গেছলাম, ওপারে।

—জমিয়েছ বল! উঠি এবার, ঘুমোও তুমি।

পরেশ-দা চলিয়া গেলে বিমল মণির চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। অন্যান্য নানা কথার পর মণি লিখিয়াছে, "তুমি অমন একটা বিচ্ছিরি কাগজে চিঠি লিখেছ কেন? ভাল দেখে প্যাড কিনো একটা। সবাই আমাকে ঠাট্টা করছিল এমন!" বিমল একটু হাসিল, নিশ্চিন্তও হইল, মণি ভালভাবেই পরীক্ষা দিয়াছে।

মানুষের কপাল যখন খোলে তখন সবদিকেই সবরকম সুবিধা হয়। সতীশবাবুর ভায়ের শেষ পর্য্যন্ত কালাজ্বরই সাব্যস্ত হইল এবং সতীশবাবুর পরিচিত মহলে বিমলের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ও অঞ্চল হইতে দুই-একটি দুরারোগ্য রোগীও আসিয়া হাজির হইল। বদিবাবু চাটুয্যে-মহিমায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। হাসপাতালের ঔষধের কিন্তু সুরাহা হইল না। নন্দী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার পর হাসপাতাল-কমিটির একটা মিটিং হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই। তাঁহারা এ-সম্পর্কে যে দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন আপাত-দৃষ্টিতে সেগুলি আশাপ্রদ হইলেও আসলে কিছুই নয়। একটি প্রস্তাব এই, হাসপাতাল-কমিটি মিউনিসিপাল কমিটিকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে ঔষধ বাবদ কিছু টাকা হাসপাতালে দেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই যে, সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হউক তিনি যেন সদর হাসপাতাল হইতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ এই হাসপাতালে ঋণ-স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মিউনিসিপালিটিতে টাকা নাই, সুতরাং প্রথম প্রস্তাবটিতে যে অনুরোধ

করা হইয়াছে তাহা পালন করিতে মিউনিসিপালিটি অসমর্থ। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী হয়তো কার্যাকরী হইতে পারিত কিন্তু বিমল শুনিল যে বর্ত্তমানে যিনি সিভিল সার্জন তিনি নানা কারণে জগদীশবাবুর করায়ত্ত। প্রথমতঃ স্বজাতি, দ্বিতীয়তঃ এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ প্রায়ই তাঁহাকে মোটা টাকার 'কল্' খাওয়াইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি এমন কিছুই করিবেন না যাহা জগদীশবাবুর স্বার্থহানিকর। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বিমলের যেরূপ নামডাক শোনা যাইতেছে, তাহাতে জগদীশবাবু মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন বই কি। মুখে অবশ্য তিনি বিমলকে সহাস্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে যাহাতে সদর হাসপাতাল হইতে ঔষধ পাওয়া যায় তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। পরেশ-দা বলিলেন, চেষ্টা উনি অবশ্যই করিবেন, কিন্তু তাহা অন্যপ্রকার। পরেশ-দা কথাই ফলিল; কয়েক দিন পরে সিভিল সার্জন উত্তর দিলেন যে, ঋণ দিবার মত বাড়তি ঔষধ সদর হাসপাতাল অথবা তাঁহার নিজের ভাণ্ডারে নাই।

কোন দিকেই যখন আশার আলোক দেখা যাইতেছে না তখন অপ্রত্যাশিত রকম একটা সম্ভাবনার সূচনা লইয়া অমর আসিয়া হাজির। সেদিনের পর অমরের সহিত বিমলের আর দেখা হয় নাই। বিমল ভাবিতেছিল নিজেই এক দিন অমরের কাছে যাইবে। যেদিন দেখা হইয়াছিল তাহার পর দিন অমরের নিজেরই আসিবার কথা ছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া বিমল বলিল—এর নাম বুঝি কাল?

—আমি এখানে ছিলাম না ভাই, কলকাতা গেছলাম।

—কেন, অসুখের জন্যে?

—অনেক টাকা খরচ করেছি সেখানে, কিছু হয় নি, এখন তোমরা

যা কর, কলকাতার উপর আর আমার বিশ্বাস নেই, অসুখের জন্যে যাই নি সেখানে।

—হঠাৎ আমাদের ওপর এত বেশী বিশ্বাস হবার মানে?

অমর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—কলকাতার ডাক্তারদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কি জান?

—কি?

—তোমরা খালি প্রাণে মার, আর কলকাতার ডাক্তাররা ধনেপ্রাণে মারেন। অনেক রকম ক'রে দেখেছি ভাই, কিছু হয় নি। আচ্ছা, অনেস্টলি বল তো ভাই সারবে কি না?

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—সারবে না।

—কখনও না!

—আমার তো মনে হয় না। বড্ড দেরী হয়ে গেছে, গোড়ায় গোড়ায় চিকিৎসা করালেও বা কিছু আশা ছিল। তুই কিছু দিন লুকিয়ে রেখেছিলি সেইটেই বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

অমর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বসিয়া বসিয়া সিগারেটের ধোঁয়ায় 'রিং' বানাইতে লাগিল। বিমলও চুপ করিয়া রহিল। যোগেন দুই পেয়াল চা সম্মুখে নামাইয়া দিয়া গেল।

এক চুমুক চা পান করিয়া অমর বলিল—যাক গে, সে যা হবার হবে, এখন আমি যে জন্যে তোর কাছে এসেছি শোন।

—কি?

—আমরা 'বিসর্জ্জন' প্লে করছি। তোকে রঘুপতির পার্ট নিতে হবে। সেবার কলেজে তুই রঘুপতির পার্ট যা করেছিলি চমৎকার!

বিমল ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্লে করিতে হইবে!

—সে কি! কোথায় প্লে হবে!

—ওপারে আমাদের ক্লাবে, আমাদের বাঁধা স্টেজ আছে বাবার এক কালে খুব সখ ছিল কিনা—বাবাই স্টেজ করিয়ে দিয়েছিলেন।

—আমার কি ভাই রোজ রোজ রিহার্সাল দেওয়া পোষাবে? একটা হাসপাতালের ভার রয়েছ, কখন কি রোগী এসে পড়ে—

অমর কিন্তু দমিবার পাত্র নয়। সে বলিল—বেশ তোমার বাড়ীতেই রিহার্সাল দেব আমরা, এখানেই এসে জোটা যাবে সন্ধ্যের পর—ক-টাই বা পার্ট?

—ফিমেল পার্ট করবার লোক আছে? অর্পণা কে হবে?

—চমৎকার লোক আছে।

বিমলের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল। বলিল—এক কাজ যদি কর ভাই রাজি আছি।

—কি?

—এখানে থিয়েটার দেখবার উৎসাহ কি রকম সকলের?

—খুব।

—পয়সা খরচ করেও দেখতে আসবে? যদি আমরা টিকিট করি?

—আসতে পারে, একবার আমরা করেছিলাম, আড়াই-শ টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল, টিকিট অবশ্য ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রী ক'রে আসতে হয়েছিল—

বিমল উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—আমি রাজী আছি, এবারও যদি তাই কর। টাকাটা কিন্তু আমার হাসপাতালে দিতে হবে, কিচ্ছু ওষুধ নেই ভাই, মহাবিপদে পড়েছি, এদিকে মিউনিসিপালিটির টাকা নেই, ওদিকে ওষুধের দোকানে ধার জমে আছে—

অমরও সোৎসাহে রাজী হইয়া গেল।

বিমল বলিল—আচ্ছা আমিই তোর ওখানে যাব না হয়। আমার বাড়ীতে রিহার্সালের গুলতালি করা ঠিক নয়। ঠিক পাশের বাড়ীতেই একটা শক্ত টাইফয়েড রোগী আছে।

—কালই তাহলে এস, দিন-পনেরো মধ্যে নামাতে হবে বইখানা, আমিও কাল থেকে তাহলে টিকিট বিক্রী করতে লেগে যাই।

—বেশ।

অমর চলিয়া গেল, বিমল একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যদিও আজ অমর বিনুর কথাটা তোলে নাই, তবু বিনুর কথাটা তাহার বার-বার মনে হইতে লাগিল। অমর এ কি নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি!

—ডাক্তারবাবু?

—ভিতরে আসুন।

যাঁহার বাড়িতে 'টাইফয়েড' তিনিই আসিলেন।

—ভূধরবাবু এসেছেন, চলুন আপনি একবার।

—চলুন, যাচ্ছি।

ভূধরবাবুর সহিত একযোগে বিমল টাইফয়েড রোগীটির চিকিৎসা করিতেছিল। টাইফয়েডের চিকিৎসা করিবার বিশেষ কিছু নাই। জল গ্লুকোজ আর ডিজিটালিস। তবু একটা চিকিৎসার ভড়ং করিতে হয়, ভূধরবাবু লম্বা প্রেসক্রপশন লেখেন, বিমল আপত্তি করে না। মাঝে মাঝে বিমলের ইচ্ছা করে সমস্ত ঔষধপত্র বন্ধ করিয়া দিতে; কিন্তু তাহা করিলে গৃহস্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। ডাক্তারিতে রোগীর অপেক্ষা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। পশার জমাইবার ইহাই মূলমন্ত্র।

ভূধরবাবু নাড়ীটি টিপিয়া বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া

রহিলেন। তাহার পর বিমলকে বলিলেন—আপনি দেখুন তো একবার পাল্‌স্‌টা।

বিমলও দেখিল, সকালে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল সেই রকমই আছে, বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। জ্বর একটু বাড়িয়াছে, সন্ধ্যার দিকে রোজই বাড়ে, তাই একটু বেশী দ্রুত।

ভূধরবাবু বলিলেন—মকরধ্বজ দেওয়া যাক্‌, কি বলেন!

মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় মকরধ্বজের বিষয় কিছুই পড়িতে হয় নাই. মকরধ্বজ সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না। তবে মকরধ্বজের কথা বাল্যকাল হইতে সে শুনিয়াছে, নিশ্চয় ভাল ঔষধ হইবে। এই যে রোজ এত পেটেণ্ট ঔষধের প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন লিখিতেছে, ইহাদের সম্বন্ধেই বা কি এমন বিশেষ জ্ঞান আছে তাহার। তবু লিখিতেছে, অনেক সময় ফলও হইতেছে।

—কি বলেন বিমলবাবু, মকরধ্বজটা দেওয়া যাক।

—বেশ তো, দিন।

—তাহলে দেখুন, খানিকটা আলোচাল জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিন, তারপর সকাল বেলা সেই জলটা ছেঁকে তার সঙ্গে মকরধ্বজটা বেশ ক'রে মেড়ে, অনেকক্ষণ ধরে মাড়বেন, মাড়াটাই আসল, বেশ ক'রে মেড়ে তারপর চাটিয়ে চাটিয়ে খাইয়ে দেবেন।

রোগীর পিতা শ্রীহর্ষবাবু শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কোন ভয়ের কারণ দেখছেন কি?

—টাইফয়েড রুগীর ভয়ের কারণ সর্ব্বদাই, আটঘাট বেঁধে রাখছি আমরা, কি বলেন বিমলবাবু?

—তা তো বটেই।

ভূধরবাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং পকেট হইতে তাঁহার কলের ফর্দ্দ

বাহির করিয়া বলিলেন—এখনও তিন জায়গায় বাকী, আর পেরে উঠছি না মহাশয়।

শ্রীহর্ষবাবু ভূধরবাবুর দক্ষিণা আনিয়া দিলেন। ঠিক পাশের বাড়ী বলিয়া বিমল কিছু লইতেছিল না। শ্রীহর্ষবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিমল হাসপাতালের দিকে গেল। হাসপাতালে আরও দুই-তিনটি নূতন রোগী ভর্তি হইয়াছে। পুরাতন সেই কালাজ্বর রোগীটি অনেক ভাল আছে,—তাহার পেটে কৃমি ছিল 'হুক ওয়ার্ম'। কৃমির চিকিৎসা করাতে তাহার পেটের ব্যথাটা কমিয়াছে। বিমল রোজ রাত্রে হাসপাতালের রোগীগুলিকে একবার দেখিয়া তবে শুইতে যায়। পরেশ-দা'র পরামর্শ অনুযায়ী সে গুপিবাবুর পাশা খেলাটা একেবারে বন্ধ করে নাই—চৌধুরী মহাশয়কে বেশী চটাইয়া ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। যতক্ষণ গুপিবাবু চৌধুরী মহাশয়ের বাসা হইতে না ফিরিয়া আসেন ততক্ষণ ভুলু, সেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার ছোকরাটি, ইনডোর রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার লইয়াছে। এ ব্যবস্থায় বিমল আপত্তি করে নাই, রোগীদের দেখিবার একজন কেহ থাকিলেই হইল। বিমল হাসপাতালে গিয়া দেখিল ভুলু বসিয়া পড়িতেছে। তাহাকে ড্রেসারি পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহারই পড়া পড়িতেছে। এ সময়ে বিমল তাহার পড়ার একটু সাহায্যও করে আজকাল, যে-জায়গাটা বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া দেয়। ভুলু এজন্য খুব কৃতজ্ঞ। বিমল আসিতেই ভুলু উঠিয়া দাঁড়াইল ও বিমলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া রোগীগুলির আর এক বার খবর লইল। বাউরি-বউটি ভাল হইয়াছে। বিমলকে দেখিয়া সে মাথায় ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া বসিল।

বিমল বলিল—তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, তুমি কাল বাড়ী চলে যাও। আবার যেন আপিং-টাপিং খেও না! ভুখীয়াকে

ডেকে আমি ধমকে দিয়েছি, সে তোমাকে কালই শাড়ী কিনে দেবে।

বধূটি ফিক করিয়া হাসিয়া লজ্জায় মাথা নত করিল। শাড়ী কিনিবার দামটা যে বিমলই দুখীয়াকে দিয়াছে সে কথাটা সে আর বলিল না। দুখীয়াকেও সে মানা করিয়া দিয়াছিল, কথাটা যেন প্রকাশ না পায়। এই গরিব বধূটির তুচ্ছ একটা শাড়ীর সখ মিটাইয়া সে মনে মনে বেশ একটা প্রসন্নতা অনুভব করিতেছিল।

অন্যান্য রোগীদের দেখিয়া বিমল যখন হাসপাতাল হইতে নামিতেছে তখন বারান্দার অন্ধকার কোণ হইতে একটি দীর্ঘাকৃতি লোক ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া খুব ঝুঁকিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরিধানে সামান্য একটি কৌপীন, মাথায় রুক্ষ চুল, লোলচর্ম্ম মুখে একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খুব লম্বা ও খুব রোগা। চক্ষু দুইটি কোটরগত। অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়।

—আমার অসুখ করেছে বাবু, আমায় ভরতি ক'রে লেন।

অতি কাতর দৃষ্টি মেলিয়া সে বিমলের দিকে চাহিল।

—কি হয়েছে তোমার?

—জ্বর হয়, বাবু রোজ।

—সকালে আসনি কেন! আচ্ছা এস দেখি।

বিমল ভিতরে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কালরোগে ধরিয়াছে—যক্ষা। ইহাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়া কি হইবে! ভরতি করা অনুচিতও, অন্যান্য রোগীদের অনিষ্ট হইতে পারে। তাহাকে সেকথা বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, সে হাসপাতালের বিছানায় শুইতে চায় না, সে ঐ গাছতলাটায় শুইয়া থাকিবে, তাহাকে যেন দুই বেলা দুটি দুটি খাইতে দেওয়া হয়, আর একটু ওষুধ।

—খেতে পাই না বাবু, খেতে পাই না, খিদের জ্বালায় মরে গেলাম—। অভিভূত বিমল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। লোকটা পা ধরিয়া কিছুতে ছাড়ে না। নিরুপায় বিমলকে শেষে ঐ ব্যবস্থাই করিতে হইল। আর কিছুই না হোক লোকটা দুই বেলা খাইতে পাইবে তো। কিন্তু কত দিন ধরিয়া সে এমন ভাবে তাহাকে রাখিতে পারিবে, তাছাড়া কয় জনকেই বা সে এমন ভাবে আশ্রয় দিতে পারে! দেশসুদ্ধ সকলেই যে প্রায় ঐ রকম! রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল ভাবিতে লাগিল যক্ষ্মারোগের শাস্ত্রসঙ্গত যে-সব বিধান আছে স্যানাটো-রিয়ম, ভাল খাবার, স্বাস্থ্যকর স্থান—আমাদের দেশের কয়টা যক্ষ্মারোগী তদনুযায়ী চলিতে পারে। যে হতভাগা-দেশের অধিকাংশ লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে সেখানে—

—বিমল না কি ?

টর্চ প্রদীপ্ত করিয়া পরেশ-দা আগাইয়া আসিলেন।

—তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কেন বলুন তো ?

—নন্দী মশায়ের ওখানে গেছলাম, তিনি বললেন যে, তোমাকে দিয়ে ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখিয়ে তাঁকে দিয়ে আসতে।

—ইলেকট্রিসিটির সম্বন্ধে ছোট প্রবন্ধ! কেন ?

—উনি বলছেন মিউনিসিপাল মিটিঙে যদি পাস হয় ওঁর প্রস্তাবটা, তাহলে ওঁরা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার চাইবেন।

—কিসের জন্যে ?

—যাতে মিউনিসিপালিটিতে ইলেকট্রিসিটি হয়! গবর্ণমেণ্ট কিছু টাকা যদি দেয় ওঁরাও সকলে কিছু কিছু দেবেন!

—যে-দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, হাসপাতালের ওষুধ নেই, সেখানে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কি হবে? হাসপাতালের ওষুধের বেলায় টাকা নেই অথচ—

—আহা বড়লোকের খেয়াল তুমি বোঝ না।

বিমল কিছু বলিল না, নীরবে পথ চলিতে লাগিল। পরেশ-দাও অকারণে টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালিয়া এদিকে-ওদিকে আলো ফেলিতে লাগিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

বিমল বলিল—প্রবন্ধ নিয়ে কি হবে?

—নন্দী মশায় বক্তৃতা করবেন।

—কোথায়।

—মিউনিসিপাল মিটিঙে! বুঝছ না, মিউনিসিপাল বোর্ডে পাস না হলে তো গবর্ণমেন্টের কাছে দরখাস্ত করা যাবে না। নন্দী মশায় তোমার প্রবন্ধটা নিয়ে বোর্ডের মেম্বারদের ইলেকট্রিসিটির উপকারিতাটা বোঝাতে চান।

একটু থামিয়া পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—ভবী কিন্তু ভোলবার নয়। মথুরবাবুর দলকে কায়দা করা শক্ত।

—মথুরবাবু কি ইলেকট্রিসিটির বিরোধী?

—ইলেকট্রিসিটির বিরোধী ঠিক নন, নন্দী মশায়ের বিরোধী। নন্দী মশায় যা করবেন মথুরবাবু এবং তাঁর দল ঠিক তার উল্টোটি করবেন।

—মথুরবাবু মানে অমরের বাবা তো?

—হ্যাঁ।

—অমরবাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে তো?

—একসঙ্গে পড়তাম আমরা।

—মথুরবাবুর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করলে নন্দীমশায় আবার না চটে যান।

বিমল বলিল—তা ব'লে তো অভদ্রতা করতে পারি না। তাছাড়া আমি ডাক্তার, কোন বিশেষ দলে আমার নাম না থাকাই ভাল। আমি—

নমস্কার ডাক্তারবাবু, সঙ্গে উটি কে, ও পরেশবাবু, নমস্কার নমস্কার।

একচক্ষু লণ্ঠনটি তুলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বর্ত্তুলাকার ভদ্রলোক, মোটা অথচ বেঁটে। বিমলকে বলিলেন —আর একবার একটু কষ্ট করতে হবে ডাক্তারবাবু, আমার মেজো ছেলেটাব গা-ময় আমবাত না কি যেন বেরিয়েছে, যদি একটু দেখতেন। আমাদের রেলের ডাক্তার জগুবাবুর যা ব্যবসা-সারা দেখা! একটি রোগ সারতে তো দেখলাম না জগুবাবুর হাতে এ পর্য্যন্ত। ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন তাই আমার মেয়ের পেটেব অসুখটা সারল।

—চলুন।

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি রুগী দেখে এস তাহলে। আজ কালী-বাড়ী থেকে একটু প্রসাদ দিয়ে গেছল, হরেন শুনছি রেঁধেছে বেশ ক'রে, তুমি আমার ওখানেই খেয়ো আজ রাত্তিরে। যোগেনকে মানা ক'রে দিয়েছি রাঁধতে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। বিমল ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুবর্ত্তী হইল। এ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিমলের কয়েকটি ব্যাগারি রুগী জুটিয়াছিল। ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় তো প্রায়ই ডাকিতেছেন। যাইতে যাইতে সমস্ত পথটাই ষ্টেশন-মাষ্টাব মহাশয় জগুবাবুর নিন্দা করিতে করিতে গেলেন। "মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে লিখে চিকিৎসার

ব্যাপার প্রায় ভুলেই গেছে আমাদের জগমোহন। সার্টিফিকেট নইলেও আবার আমাদের চলে না, জগুকে চটানও মুস্কিল। ইদিকে ভয়ানক কান-পাতলা লোক আবার।"

বিমল বলিল—আপনাদের জগুবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে হবে এক দিন।

—সেদিকে জগু ঠিক আছে, আলাপে মোহিত ক'রে দেবে একেবারে। কেউ এক বার গেলেই হ'ল চা রে জলখাবার রে, জগমোহন মিস্ত্রিরের সেদিকে কোন ত্রুটিটি ধরবার উপায় নেই।

জগু-প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনমানসে বিমল বলিল—আপনি কত দিন থেকে আছেন এখানে?

—তা হয়ে গেল বছর-দুই মশাই, এসে থেকে ভুগছি মশায় ছেলে-পিলে নিয়ে, এটা ওঠে তো ওটা পড়ে, আর আমার পরিবার তো রোগের একটি ডিপো বললেই হয়, কি যে ওর হয় নি তাই আমি ভাবি!

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কেবল ক্যান্‌সারটাই হ'তে বাকি আছে বোধ হয়, আর সব হয়ে গেছে। জগু তো টি. বি. ব'লে ডিক্লেয়ারই করেছে, ভূধরবাবু বললেন, ফ্যারিনজাইটিস্, জগদীশবাবু বললেন টনসিল খারাপ, আপনি যদি দেখতে চান দেখুন—হয়রান হয়ে উঠেছি মশায়, পারি না আর।

• •

ষ্টেশন-মাষ্টারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিমল ভাবিল বদিবাবুর খবরটা একবার নেওয়া যাক। সতীশবাবুর ভাইয়ের চিকিৎসা সে করিতেছে বটে কিন্তু এখনও এক পয়সা পায় নাই। তাঁহারাও দেয়

নাই, বিমলও চাহে নাই। এ সম্বন্ধে কি করা উচিত সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বদিবাবু যাহা বলেন তাহাই করা যাইবে। থিয়েটারের কথাটাও বদিবাবুর কানে তোলা উচিত। মথুরবাবুদের সঙ্গে হৃদ্যতার জন্য নয়, হাসপতালের ঔষধের জন্যই সে এ কার্য্য করিতে রাজী হইয়াছে, তাহা বদিবাবুকে অন্ততঃ জানাইয়া রাখা ভাল। জায়গাটায় যেরূপ দলাদলি তাহাতে বুঝিয়া সুঝিয়া চলাই ভাল। বুঝিয়া চলিলে এ স্থানে বেশ রোজগার হইবে, বেশ বড়লোকের জায়গা। ভূধরবাবুর কথাগুলো তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল, এখনও তিনটে বাকি, আর পারি না মশাই। এই অল্প কয়েক দিনে সে-ও তো এদিকে-ওদিকে দুই-চারিটা রুগী পাইয়াছে এবং সকলেই বিনাপয়সার নয়। হাসপাতালটাকে দাঁড় করাইয়া ফেলিতে পারিলে তাহার পশার জমাইতে দেরি হইবে না। ঔষধ কিছু অবিলম্বে চাই। বদিবাবুর বাড়ী গিয়া বিমল শুনিল যে বদিবাবু এখানে নাই। কংগ্রেসের কাজে বাহিরে গিয়াছেন, তিন-চার দিন পরে ফিরিবেন।

৬

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বনিয়াদি বংশের সন্তান। পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে অক্লেশে মুর্শিদকুলি খাঁর আমল পর্য্যন্ত তাঁহাদের গৌরবময় ইতিবৃত্তি সংগ্রহ করা যায়। নানারূপ দলিল, পাঞ্জা, সনন্দ, তরবারী, উষ্ণীষ, ছবি তাঁহাদের গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিয়া এখনও মথুরাবাবুর গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছে। মথুরামোহনের পিতামহই সম্ভবতঃ এ-বংশের শেষ মহিমা। তাঁহার বজরা, ঘোড়া, রোশনচৌকি, তাঁহার অমিত বিক্রম, তাঁহার অহেতুক দয়া, তাঁহার

আকস্মিক ক্রোধের কাহিনী এখনও এ অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত রহিয়াছে। মথুরামোহনের পিতার সময়ে এ অঞ্চলে প্রথম রেল-লাইন আসে, সিগারেট আসে, ক্যামেরা আসে। সুতরাং কোট-প্যান্তালুন পরিয়া সাহেবী কায়দায় চলা-বলা আহার-বিহার—এইটাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি নাকি পুরা সাহেব ছিলেন। তাঁহার যে প্রতিকৃতিখানি রহিয়াছে সেটিও সাহেবী—পোষাকে। তাঁহার পরিচ্ছদ, আসবাব, এমন কি অনেক খাদ্যদ্রব্যাদিও নাকি সাহেব-বাড়ী হইতে আসিত। তিনিই নাকি এ-অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে বিস্কুট ও পাঁউরুটি আহার করেন। জনৈক সিভিলিয়ান বন্ধুর সহিত বিলাতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে বাইনাচ, যাত্রা, দোল, দুর্গোৎসব হইত, বড় বড় তানপুরা লইয়া দিল্লী, লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদেরা আসিয়া আসর জমাইতেন। সম্ভবতঃ উভয় প্রকার শালীনতা বজায় রাখিতে গিয়াই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়েই পৃথিবীর নশ্বরতা সম্বন্ধেও তাঁহার চৈতন্য হয় এবং তিনি সপরিবারে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে থাকেন। এত কাল তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না, পশ্চিমে থাকিতে থাকিতে সন্তানসম্ভাবনা হইল এবং মথুরা শহরে মথুরামোহন জন্মগ্রহণ করিলেন।

বিমলের সহিত মথুরামোহনের এক দিন আলাপ হইয়া গেল। থিয়েটারে রিয়ার্স্যাল দিবার জন্য প্রথম যেদিন সে ওপারে গেল, সেই দিনই অমরের বাড়ী যাইতে হইল। বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল কল্পনায় সে মথুরামোহনকে যাহা ভাবিয়াছিল আসলে তিনি মোটেই সেরূপ দেখিতে নহেন। বিমল আশা করিয়াছিল দাম্ভিক পরাক্রান্ত

ক্ষমতাপ্রিয় এক জন উদ্ধতনাসা উগ্রগুম্প ব্যক্তিকে দেখিবে, কিন্তু দেখিল এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ব্যাক্তিকে। মথুরামোহন দেখিতে অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির। পরিধানে থান, গায়ে একটি অতি সাধারণ ধরণের ফতুয়া, পায়ে চটি, কেশবিরল মস্তক, চোখেমুখে একটি স্নেহ-কোমল মৃদু হাসি, দেখিয়া মনে হয় না যে ইনি কোন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারেন। অথচ ইঁহারই ভয়ে ওপারের অধিকাংশ লোক সন্ত্রস্ত —বিশেষতঃ মিউনিসিপালিটির মেম্বরেরা। আপাতদৃষ্টিতে লোকটির মধ্যে ভয়ঙ্কর তো কিছুই বিমল দেখিতে পাইল না। খানিক ক্ষণ আলাপের পর মথুরবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—তুমি অমরের বন্ধু এ-কথা আগে জানলে তোমাকে এখানে আসতে মানা করতাম আমি।

—কেন ?

সহসা তাঁহার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন —মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনেয় কোন ভদ্র সন্তান ভালভাবে থাকতে পারে না, ঐ মাইনেতে যারা টিকে থাকবে তারা ভাল হ'লেও দিন-কতক পরে খারাপ হয়ে যাবে। মাইনে ভাল না দিলে কাজ ভাল হয় না, হ'তে পারে না !

বিমল বলিল—সে তো ঠিকই। কিন্তু মিউনিসিপালিটির যা অবস্থা তাতে বেশী মাইনে দেবে কি ক'রে ! হাসপাতালে ওষুধ পর্য্যন্ত নেই !

তা তো জানি। আমার মতে হাসপাতাল তুলে দেওয়া উচিত। ওরকম একটা প্রহসন রাখার চেয়ে না রাখা ভাল !

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

অমর বলিল—আমরা ক্লাবে এবার টিকিট ক'রে বিসর্জ্জন প্লে করছি। টাকা যা হবে সব হাসপাতালে দেব আমরা !

—ভাল।

মথুরামোহন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া সহসা বলিলেন—একটা কথা কিন্তু জেনে রোখো, আমি তোমার শত্রুপক্ষ। তোমার কোন ত্রুটি পেলে ছেড়ে কথা কইব না আমি!

বিমল বলিল—ত্রুটি হ'তে দেব কেন।

—মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাবে, ত্রুটি হ'তে দেব না বলছ কোন সাহসে!

মথুরবাবু কান হইতে রূপার খড়কেটি নামাইয়া লইয়া হাসিমুখে দাঁত খুঁটিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—আচ্ছা সে দেখা যাবে!

অমর হাসিয়া বলিল—চল ক্লাবে যাওয়া যাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিমল উঠিয়া মথুরবাবুকে প্রণাম করিয়া পুনরায় পদধূলি লইতে গেলে মথুরাবাবু বলিলেন—এই তো এখুনি এক বার প্রণাম করলে আবার কেন! ও-সব পায়ের ধুলোটুলো নিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বি অন ইওর গার্ড—

একটু হাসিয়া বিমল ও অমর বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বলিল—তোর বাবার সম্বন্ধে যে-রকম ভয়াবহ সব গুজব শুনেছিলাম, ভয় হয়ে গিয়েছিল আমার। এত ভাল লোক অথচ সবাই এত ভয় করে কেন বল্ দিকি।

—ভাল লোক বলেই।

—মানে?

—মানে মিউনিসিপালিটিতে উনিই একমাত্র লোক যিনি ঠিক নিয়ম মেনে চলতে চান আর ঘুস নেন না!

—বাকী সবাই?

—বাকী সবাই মিউনিসিপালিটিকে নানাভাবে দোহন করছে !

—বদিবাবুও ?

—নিশ্চয়। ওপারে ওঁর অতগুলো বাড়ী, মিউনিসিপালিটিকে হাতে না রাখলে ওঁর চলবে কি ক'রে ? নিজের ইচ্ছেমত প্ল্যান, নিজের ইচ্ছেমত কল, যখন যা খুশী করিয়ে নিচ্ছেন। নিজে তো যা খুশী করিয়ে নিচ্ছেন, নিজের অনুগৃহীত লোকদের করিয়েও দিচ্ছেন ! খুব তুখোড় লোক।

বদিবাবুর নিন্দা শুনিতে বিমলের ভাল লাগিতেছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

বিমলরা চলিয়া গেলে মথুরবাবু অন্দরে গেলেন। গিয়াই শেফালির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। শেফালি মথুরাবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা, বড় আদরিণী। ষোল-সতের বছর বয়স।

—বাবা, বারান্দায় ব'সে কার সঙ্গে কথা বলছিলে বিমলবাবু, নয় ?

—তুই কি ক'রে দেখলি !

—বাঃ, দোতলার জানলা থেকে দেখা যায় না বুঝি বারান্দাটা !

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মথুরবাবুর স্ত্রী বলিলেন—বারান্দাটা দেখা যায় বলেই উঁকি মেরে দেখতে হবে, ধন্য বাবা আজকালকার মেয়ে তোমরা ! ভদ্রলোক যদি দেখতে পেতেন !

—দেখতে পেলেই হ'ল ! আমি তো কেবল খড়খড়িটা একটুখানি ফাঁক ক'রে দেখেছি।

—কি দরকার তোমার দেখবার মা।

—আমার খুড়শ্বশুরের অসুখ তো উনিই ভাল করেছেন, সেই জন্যে দেখছিলাম কেমন দেখতে লোকটি !

শেফালি হাসিতে লাগিল, মথুরবাবুও তাহার পানে সস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

—তুমিই আদর দিয়ে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করবে দেখছি।

এক খিলি পান ও কিছু দোক্তা মুখে ফেলিয়া দিয়া সকোপ কটাক্ষে মথুরা-গৃহিণী মথুরাবাবুর পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন—কালই দাঁড়াও বেয়াইকে খবর দিচ্ছি, নিয়ে যান তোমাকে!

—ইস্, আমি যাচ্ছি কি না এখন।

ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে শেফালি বৌদিদির ঘরে গিয়া ঢুকিল। মথুরবাবুও উঠিয়া ধীরে ধীরে বাথরুমে গিয়া খিল দিলেন মথুরবাবুর বাথরুম একটি দেখিবার মত জিনিষ, বলিয়া না দিলে বাথরুম বলিয়া বোঝা শক্ত। দুইতিন রকমের গদি-আঁটা চেয়ার, একটি সোফা, দেয়ালে নানা রকমের ছবি, এক কোণে একটি আলমারিতে নানা বই. একটি ছোট টেবিলের উপর সব রকমের খবরের কাগজ, নিকটে একটি ছোট মিটসেফের ভিতর চকোলেট, লজেন্‌স্ প্রভৃতি মুখরোচক টুকি-টাকি খাবার, দেয়ালের গায়ে কাঠের একটি সুদৃশ্য শেল্‌ফ্ তাহাতে তাঁহার প্রিয় কয়েক রকম পেটেণ্ট ঔষধ, আর একটি দেয়ালে চমৎকার একটি ঘড়ি। ঘরের ভিতর হইতেই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় জানালাটি খুলিয়া দিলেই হইল। মথুরাবাবুর বাথরুম তাঁহার বৈঠক-খানা অপেক্ষা বেশী আরামজনক। এই ঘরখানির ঠিক পাশেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট একটি স্নানের ঘরও অবশ্য আছে। মথুরবাবু নির্জ্জনতা ভালবাসেন এবং স্নান করিবার অছিলায় বাথরুমে ঢুকিয়া জনতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করেন। এক বার বাথরুমে ঢুকিলে দুই-তিন ঘণ্টা তিনি বাহির হন না এবং দুই বেলা তাঁহার বাথরুমে ঢোকা চাই-ই। মথুরাবাবু বাথরুমে ঢুকিয়া খিল দিলেন। মথুরাবাবুর

গৃহিনী মন্দাকিনী বাথরুমের রুদ্ধ দ্বারের পানে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া আর এক খিলি পানও আর একটু দোক্তা আলগোছে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। চশমার খাপ ও মহাভারতখানি বাহির করিয়া আনিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর আপন মনেই বলিলেন—নিজে আর পড়িতে পারি না, বাপু, বৌমা, ও বৌমা, কোথা তুমি—

বিনোদিনী পাশের ঘরেই ছিল, বাহির হইয়া আসিল।

—কি মা?

—কি করছ তুমি?

—কিছুই না।

—আচ্ছা, তাহলে মহাভারতের একটুকু আমাকে প'ড়ে শোনাও তো মা! ঐটুকু হলেই কর্ণপর্ব্বটা শেষ হয়ে যায়। আমি আর পারছি না পড়তে—

বিনোদিনী বসিল ও মহাভারত লইয়া পড়িতে সুরু করিল—

হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন তদ্রূপ তুমি শর-নিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ-বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহুদিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষ-প্রধান যুধিষ্ঠির—

অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সহসা মন্দাকিনী বলিলেন—আচ্ছা বৌমা, তোমার চুলের এ কি ছিরি! চুলে তেলটেল দাও না, আজকাল

তোমাদের কি যে ফেসিয়ান হয়েছে মা, চুল ভেজাবে না কিছুতেই! চুল-বাঁধুনী এসেছিল তো আজ, চুলটা ভাল ক'রে বেঁধে নিলেই পারতে!

বিনোদিনী কিছু বলিল না, লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেও যে ব্রহ্মচর্য্যের চর্চা করিতেছে এ কথা তো শাশুড়ীকে বলা যায় না।

শাশুড়ী বলিলেন—চল আমিই তোমার চুলটা বেঁধে দি, মহাভারত কাল শুনিয়ো! চল, ওঠ।

বিনোদিনীকে লইয়া মন্দাকিনী উঠিয়া গেলেন।

বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে যখন মন্দাকিনী প্রথম শুনিলেন যে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপনে একটি কলেজে-পড়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল! কলেজে-পড়া মেয়ে; না জানি সে কি জাতীয় জীবই হইবে। কি জাতীয় জীব যে হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব অস্পষ্ট ছিল না। হাই-হীল জুতা-পরা, ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে অবগুণ্ঠন-হীনা শিক্ষিতা মহিলা মন্দাকিনী ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং দুর্ভাবনাটা সেই জন্যই বেশী হইয়াছিল। কিন্তু বিনোদিনী তাঁহার সে দুর্ভাবনা ঘুচাইয়াছে। অল্প দিনেই মন্দাকিনী বুঝিলেন যে এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে দুর্লভ। ব্রত-আচার, পূজা-পার্ব্বণ সব বিষয়ে নিখুঁত। যেমন লজ্জা, তেমনি ধীরস্থির। মুখে লক্ষ্মীশ্রী আছে। কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই, বরং তাহার প্রসাধন সম্বন্ধে উদাসীনতাই ইদানীং মন্দাকিনীকে পীড়িত করিতেছে।

গঙ্গার ধারেই বিমলের বাসা। ঘাট হইতে বাসা বেশী দূরে নয়। গভীর রাত্রি, চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। একটি ছোট পানসি আসিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে ভিড়িল এবং পানসি ভিড়িতে অমর ও বিনোদিনী নামিয়া পড়িল।

অমর বলিল—চল বিমলকে জাগানো যাক।

—না, না, কি দরকার, চল, মা যদি জানতে পারেন, ভয়ানক কাণ্ড করবেন।

—কিছু করবেন না, চল না! অনেক দিন পরে বিমল তোমাকে দেখে ভারি খুশী হবে! বলছিল আজ তোমার কথা।

—কি বলছিল?

—বলছিল বিনুকে নিয়ে এস এক দিন আমার বাড়ীতে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিমলবাবুকে বিনোদিনীর মনে পড়িল। অমরের সহিত বিমল কয়েকবার বিনোদিনীদের বাড়ীতে গিয়াছিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিল বিমলবাবু কি এখনও তেমনি লাজুক-প্রকৃতির আছেন নাকি? তখন তো কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিতেন না।

বিমল স্বপ্ন দেখিতেছিল, মণিকে। পরীক্ষা দিয়া মণি যেন বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। বিমল এক বোতল কডলিভার অয়েল লইয়া তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, সে কিছুতেই খাইবে না। বড় দুর্গন্ধ! দুধও খাইবে না, খাইতে ভাল লাগে না।

—ডক্তোরবাবু, ও ডাক্তারবাবু—

বিমল বিছানায় উঠিয়া বসিল, তবুও স্বপ্নের ঘোর যেন কাটিতে চায় না। ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিল জানালা দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া নীরব মাধুর্য্যে সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে।

—ডাক্তারবাবু—

কপাট খুলিয়া বিমল দেখিল অমর ও বিনোদিনী দাঁড়াইয়া আছে। এও স্বপ্ন নাকি!

৭

যদিও হাসপাতালে ঔষধ নাই তথাপি বিমলের সদয় ব্যবহারের গুণে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিমল লক্ষ্য করিল এখানে গরিব লোকদের ভিতর কালাজ্বর খুব বেশী, অথচ হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসা করিবার মত ইন্‌জেকশনের ঔষধ প্রচুর নাই। অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা কম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে নিজের প্রথম মাসের বেতনটা ব্যয় করিয়া কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌শন আনাইয়া ফেলিল। লেখালেখি করাতে দরও কিছু সস্তা হইল। কালাজ্বর-রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া এবং চিকিৎসা করিয়া বিমলের সময় ভালই কাটিতে লাগিল। বিমল ভাবিয়া দেখিল যে চাকরি না পাইলে কোথাও না কোথাও তাহাকে ডিসপেনসারি খুলিয়া তো বসিতে হইত এবং অনিবার্য্যভাবে কিছু অর্থব্যয় হইতই। প্র্যাকটিস জমাইবার জন্য প্রথম প্রথম কিছু খরচ করিতেই হয়, সুতরাং এই খরচটা করা এমন কিছু অবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। হাসপাতালের এই দরিদ্র রোগীরা মুক্তকণ্ঠে তাহার নাম চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞাপিত করিবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের জন্যও তো একটা প্রয়োজনীয় খরচ আছে। ব্যবসায়ের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাতে নিঃস্বার্থপরতা অপেক্ষা স্বার্থপরতার আমেজই বেশী ছিল, কিন্তু চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ইন্‌জেকশন দিয়া অনেক রোগী ভালও হইতে লাগিল।

একদিন হাসপাতালের কাজ সারিয়া বিমল বাহির হইতেছে এমন সময় এক বুড়ী আসিয়া তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। বুড়ী বিমলের অচেনা নয়, এখানে আসিয়া অবধি বুড়ীকে সে প্রত্যহই দেখিতেছে, রোজ তাহার হাসপাতালে আসা চাই। সে আসিবার আগেও নাকি বুড়ী রোজ আসিত। তাহার অসুখ মাথাধরা, কিছুতেই সারিতেছে না।

—কি চাই তোমার, ওঠ, ওঠ।

—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।

—কিসের ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে ?

—মাথাধরার ! কত লোক ইন্‌জেকশন নিয়ে নিয়ে সেরে গেল আমার চোখের সামনে, আমারই কিছু হচ্ছে না—

—ওষুধ খাও, সারবে।

—লাল, নীল, সাদা কত রকম ওষুধই তো খেলাম। ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না বাবু—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন, দোহাই আপনার ডাক্তার বাবু—

—কি মুস্কিল, তোমার তো আর কালাজ্বর হয় নি, কি ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে।

—সব অসুখেরই ইন্‌জেকশন আছে, সেদিন ঐ রক্ত-আমাশয় রুগীটা এল, একটা ইন্‌জেকশম দিতেই সেরে গেল !

বুড়ী রোজ হাসপাতালে আসে এবং কোথায় কি হয় লক্ষ্য করে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বিমল তথাপি বলিল—মাথাধরার ইন্‌জেকশন নেই কোন।

বুড়ী কিন্তু মানিল না, বিমলের পিছু লইল। বহুকাল পূর্ব্বে মৃত তাহার স্বামীর উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—সে ম'রে ইস্তক আমার এত হেনস্তা ডাক্তারবাবু ! নিজের পেটের ছেলে, এত ক'রে খাইয়ে-পড়িয়ে মানুষ করলাম সেই এখন দেখে না, বউ নিয়ে উন্মত্ত। বউও জুটেছে একটা ডাইনী, নিজের পেটের ছেলেগুলোকেই টপটপ ক'রে খেয়ে ফেললে, ঘরদোর শ্মশান হয়ে গেল আমার ! এত লোকের মরণ হয় আমারই কেবল হয় না? যমেরও অরুচি অমি—

বিলাপ করিতে করিতে বুড়ী বিমলের বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া হাজির

হইল। বিমল তাহাকে আরও দুই-এক বার বলিল যে, তাহাকে দিবার মত ইন্‌জেকশন তাহার নাই। বুড়ী কিন্তু কিছুতেই শোনে না। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—নিজের পেটের ছেলেই যাকে দেখে না তাকে অপরে দেখবে কেন, কিন্তু আপনি শুনেছিলাম ভাল লোক, দয়াধর্ম্ম আছে, তাই সাহস ক'রে—

বুড়ী ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল। নিরুপায় বিমল শেষটা ঠিক করিল খানিকটা জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহারই দুই-চারি ফোঁটা বুড়ীকে ইন্‌জেকশন করিয়া দেওয়া যাক। নাছোড়বান্দা বুড়ী কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল—আচ্ছা ব'স, দিচ্ছি ইন্‌জেকশন!

টেষ্ট-টিউবে জল গরম করিতে করিতে বিমলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। মাইক্রসকোপের কাজের জন্য তাহার কাছে "মেথিলিন ব্লু"র কতকগুলি বড়ি ছিল। ময়দার গুলির ভিতর "মেথিলি ব্লু"র কয়েকটি গুলি লুকাইয়া বিমল সেগুলি বুড়িকে দিল এবং জলের ইন্‌জেকশন দিয়া অবশেষে বলিল—এই বড়িগুলোও খেও। বড় কড়া ইন্‌জেকশন শরীরের সমস্ত বিষ বেরিয়ে যাবে।

বুড়ী খুশী হইয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বুড়ীর সহিত এই প্রবঞ্চনাটুকু করিয়া বিমলের ভারি আনন্দ হইল। ডাক্তারি করিতে কত প্রবঞ্চনাই যে করিতে হয়! দুঃস্থ লোককে সান্ত্বনা দেওয়াই যখন পেশা তখন প্রবঞ্চনা করিতে হইবে বইকি! কয়টা লোককে সত্য কথা বলিয়া আশ্বস্ত করা যায়!

আহারাদি শেষ করিয়া বিমল আবার হাসপাতালের দিকে রওনা হইল। সাধারণতঃ এ সময়টা সে একটু বিশ্রাম করে, কিন্তু আজ ফিমেল ওয়ার্ডে একটি নিউমোনিয়া রোগিণীকে সে ভর্ত্তি করিয়াছে, তাহার রক্তটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। হাসপাতালের গেটে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় তাহার নজরে পড়িল একটি আধ-বয়সী মেয়ে

আধঘোমটা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার হাতে একটি গামলায় কলাপাতা দিয়া কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

—কে তুমি?

মেয়েটি মাথার ঘোমটা আর একটু টানিয়া দিয়া মাথা নিচু করিয়া বলিল—আমি বাবু ঠাকুরের পরিবার।

—হাসপাতালের শিবু ঠাকুরের?

—হাঁ।

—গামলাতে ও কি?

মেয়েটি একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

বিমল বলিল—কি আছে ওতে, দেখি ঢাকা খোল তো।

অতিশয় সঙ্কোচভরে মেয়েটি কলাপাতার ঢাকাটা খুলিয়া বলিল—হাসপাতালের রুগীদের দিয়ে যা ভাত বেঁচেছিল তাই নিয়ে যাচ্ছি—

বিমল দেখিল অন্ততঃ চার-পাঁচ জনের ভাত ডাল তরকারি গামলাতে রহিয়াছে।

—এত ভাত বেঁচেছিল? বল কি। মোটে তো দশ-বারো জন রুগী আছে। এস আমার সঙ্গে।

হাসপাতালে ঢুকিয়া অনুসন্ধান করিয়া বিমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিবুঠাকুরের ভয়ে কোন রুগী প্রথমে কোন কথা বলিতেই চায় না। বিমল অভয় দেওয়াতে অবশেষে সকলে বলিল যে তাহারা কোনদিনই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাদের এক-আধ মুঠা দিয়া সমস্তই শিবু-ঠাকুর প্রত্যহ লইয়া যায়। ভৈরব চাকরও প্রত্যহ তাহাদের অন্নে ভাগ বসায়।

বিমল বলিল—আচ্ছা ব্যবস্থা করছি।

তৎক্ষণাৎ ভৈরব ও শিবুকে ডাকিয়া বিমল তাহাদের বেতন চুকাইয়া দিল এবং গুপিবাবুকে ডাকিয়া বলিল যে, একজন নূতন ঠাকুর এবং

নূতন চাকর অবিলম্বে চাই। ইহাদের আর রাখা চলিবে না। গুপিবাবু সহজে কোন কথা বলেন না, বলিলেও খুব কম বলেন। চশমার কাঁচের উপর দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তিনি সমস্ত ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন ও সংক্ষেপে বলিলেন—আচ্ছা, দেখি। চট ক'রে পাওয়া মুস্কিল।

রুকমি আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল —মুস্কিল কিসের, নরু ঠাকুর তো ব'সে আছে, কেষ্টাও ব'সে আছে, ডাকলেই আসবে।

—তুই সব কথার মাঝখানে ফোড়ন দিস কেন বল ত? আ গেল যা!

জানকীও তাহাকে ধমকাইয়া দিল—তুই বাড়ী যা না!

রাগে গর গর করিতে করিতে রুকমি চলিয়া গেল।

বিমল জানকীকে আদেশ করিল নরু ঠাকুর ও কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া অনিতে, আজই সে তাহাদের বাহাল করিবে।

ফিমেল ওয়ার্ডে নূতন রোগিণীটির রক্ত আনিতে গিয়া বিমল দেখিল সেদিনকার সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারীটা তাহার বিছানার পাশে মাটিতে বসিয়া একদৃষ্টে মেয়েটার মুখের পানে চাহিয়া আছে।

—তুমি এখানে ব'সে আছ কেন?

গুপিবাবু বলিলেন—এই নিয়ে চার বার হ'ল! এর আগে তিন বার মানা করেছি আমি। সেই থেকে কেবল এইখানে ঘুরঘুর করছে।

বিমল বলিল—যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং বটগাছতলায় গিয়া বসিল। একটু পরে বিমল রক্ত পরীক্ষা করিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছে, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বাবু!

—কি ?

—ও মেয়েটা কি বাঁচবে ?

—তুমি ওখানে গেছলে কেন ? আর যেও না।

—আচ্ছা বাবু।

বিমল চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—ও কি বাঁচবে বাবু ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—আমার অমনি একটি মেয়ে ছিল, বিনা ওষুধে বেঘোরে জ্বরে ছট্‌ফট্ করতে করতে মরে গেছে সে বাবু !

বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহার কোটরগত চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। বিমল দাঁড়াইয়া পড়িল।

—এ কি বাঁচবে বাবু ? একটুকুও তো জ্ঞান নেই।

—শক্ত ব্যারাম, নিউমোনিয়া হয়েছে।

—আহা, শুনলাম ওর বাপ-মা কেউ নেই !

সত্যই মেয়েটি অনাথা, ওপারের অনাথ-আশ্রম হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। বিমল চলিয়া যাইতেছিল, আবার সে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল —আমি ওর কাছে ব'সে যদি হাওয়া-টাওয়া করি তাতে ক্ষেতি কি বাবু ?

—না, তুমি যেও না। ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যাওয়া মানা।

সে আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল বাড়ীতে পদার্পণ করিতে-না-করিতেই শ্রীহর্ষবাবু—পাশের বাড়ীর সেই ভদ্রলোক যাঁহার ছেলের টাইফয়েড হইয়াছে—তিনি হন্তদন্ত হইয়া হাজির হইলেন।

—পাইখানার সঙ্গে খানিকটা রক্ত বেরিয়েছে যেন মনে হচ্ছে।

বিমলের মুখ শুকাইয়া গেল।

—তাই নাকি ? চলুন তো দেখি।

গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুখ আরও শুকাইয়া গেল। সত্যই 'হেমারেজ' আরম্ভ হইয়াছে।

—ভূধরবাবুকে খবর দিন।

শ্রীহর্ষবাবু বলিলেন—লোক পাঠিয়েছিলাম, তিনি বাড়ীতে নেই।

—জগদীশবাবুকে খবর দিন তাহলে, আর এই ইনজেকশনটি তাড়াতাড়ি আনিয়ে নিন।

লোক ছুটিল।

বিমল রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিল, নাড়ীর গতি ক্রমশঃই দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। পেটের ভিতর আরও রক্তক্ষয় হইতেছে নিশ্চয়। অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার।

জগদীশবাবুকে যে লোক ডাকিতে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল —জগদীশবাবুও বাড়ীতে নাই। বিমল ইন্‌জেকশনের জন্য যে 'সিরাম'টি আনিতে দিয়াছিল তাহাও এখানে পাওয়া গেল না। বিমল শেষে নিজের ব্যাগ হইতে মর্ফিয়া বাহির করিয়া আনিল। মর্ফিয়াও ইহার একটি ঔষধ।

শ্রীহর্ষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটা কি ইন্‌জেকশন দেবেন ?

—হাঁ।

—কি ওটা ?

—মর্ফিয়া।

—ওটা দিলে তো—

শ্রীহর্ষবাবু বাক্যটা সম্পূর্ণ করিলেন না বটে, কিন্তু অর্থ বুঝিতে বিমলের কষ্ট হইল না। মর্ফিয়া দেওয়াটা বিপজ্জনক কি না তাহাই শ্রীহর্ষবাবু জানিতে চাহিতেছেন। মর্ফিয়া ঔষধটি শক্তিমান ঔষধ, শক্তিমান জিনিষ মাত্রেই নিরাপদ নয়। কিন্তু সে-কথা শ্রীহর্ষবাবুকে

বলিলে তিনি আরও ঘাবড়াইয়া যাইবেন। হেমারেজে মর্ফিয়া বহুকালের সনাতন ঔষধ, বিমল নূতন কিছু করিতেছে না। তা ছাড়া অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার। বিমল বলিল—ও ওষুধটা যখন পাওয়া গেল না এইটেই দেওয়া যাক, এটাও হেমারেজের একটা ওষুধ। ক্যালসিয়মও একটা দিচ্ছি।

বিমল মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া দিল। ক্যালসিয়মও দিল। একটু পরেই ছেলেটি ঘুমাইয়া পড়িল।

সে ঘুম কিন্তু আর ভাঙ্গিল না।

রাত্রি আটটা নাগাদ ভূধরবাবু আসিলেন এবং নাড়ী টিপিয়া মুখ-বিকৃতি করিলেন, কিছু বলিলেন না, চলিয়া গেলেন। আর একটু পরে জগদীশবাবু আসিলেন ও মর্ফিয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া এমন একটা মুখভাব করিলেন যাহা অবর্ণনীয়। সে মুখভাবে রোগীর জন্য আফশোষ, বিমলের অজ্ঞতার জন্য অনুকম্পা, রোগীর পিতার জন্য সহানুভূতি এবং তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে না ডাকাতে কি কাণ্ডটা হইল এই ধরণের একটা গর্ব্ব একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

অপ্রস্তুত বিমল বলিল—হেমারেজে মর্ফিয়া দিতে কেতাবে তো লেখে।

—কেতাবে অনেক কথাই লেখে।

জগদীশবাবুর মুখটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি বিমলকে যেন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। কেতাবাতীত অভিজ্ঞতার মহিমা লইয়া জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন।

বিমূঢ় বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

একটু পরেই ক্রন্দনের রোল উঠিল—নারীকণ্ঠের আর্ত্ত হাহাকার—ওরে বাবা রে আমার ছেলেকে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরে ফেল্লে রে।

সেদিন রাত্রে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় তুলু আসিয়া বিমলের ঘুম ভাঙ্গাইল—হাসপাতালে সেই নিমোনিয়া-রোগীটার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গরমের জন্য তুলু রোজ আসিয়া হাসপাতালের বারান্দায় একটি ক্যাম্প-খাট বিছাইয়া শয়ন করে, আজও শুইয়াছিল। হঠাৎ ফিমেল ওয়ার্ড হইতে একটা দারুণ চীৎকার শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে গিয়া দেখে স্বল্প অন্ধকারে সেই লম্বা ভিখারী বুড়াটা ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভয়ে চীৎকার করিতেছে। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়িতেছে দেখিয়া তুলু গুপিবাবুকেও উঠাইয়াছিল।

গুপিবাবু বিমলকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

বিমল গিয়া দেখিল মেয়েটি মারা গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ভয়েই হার্ট ফেল করিয়াছে।

ভিখারী বুড়াটা বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

বিমলের ভয়ানক রাগ হইল। তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া বিমল বলিল—বেরিয়ে যাও তুমি হাসপাতাল থেকে—

টাল সামলাইতে না পারিয়া লোকটা পড়িয়া গেল। তাহার পর হইতে আর কেহ তাহাকে হাসপাতালের ত্রিসীমানায় দেখে নাই।

৮

অতি প্রত্যূষে দাঁতন-হস্তে বদিবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

—ডাক্তার বাবু, আপনি একটা ভারি অ-রাজনৈতিক কাজ ক'রে ফেলেছেন।

—কি বলুন তো?

—শুনলাম, মথুর মুখুজ্যেদের ক্লাবে গিয়ে আপনি মিশেছেন!

—মিশলেই বা।

বদিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন, তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, চালে একটু ভুল হয়েছে! আমাদের সমস্ত জীবনটাই তো একটা দাবাখেলা, চালে ভুল হলেই মাৎ হয়ে যেতে হবে! ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি—

বিমল ব্যাপার সমস্ত খুলিয়া বলিল এবং উপসংহারে বলিল—অমর আমার অনেক দিনের বন্ধু, তার অনুরোধ এড়ানো একটু শক্ত, কিন্তু বন্ধুত্বের জন্যে এ-কাজ আমি করি নি, আমি করেছি হাসপাতালের জন্যে। থিয়েটার থেকে শ-দুই আড়াই হতে পারে! হাসপাতালে একেবারে ওষুধ নেই যে আমি আমার নিজের মাইনে দিয়ে ওষুধ কিনে চালাচ্ছি—সবই তো জানেন আপনি!

বদিবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, এই বার ফতুয়ার পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া বিমলের হস্তে দিয়া বলিলেন—এই নিন।

বিমল সবিস্ময়ে দেখিল পাঁচ শত টাকার একখানি চেক।

—এ কোথা পেলেন?

বদিবাবু কিছু না বলিয়া স্মিতহাস্যে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন।

—আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—টাকাটা পেলেন কি ক'রে?

—বিমল চাটুয্যের পক্ষে যদি এক মাসের মাইনেটা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, বদি চাটুয্যের পক্ষে পাঁচ-শ টাকা জোগাড় করা কিছু অসম্ভব নয়!

বিমল হাসিতে লাগিল।

বদিবাবু বলিলেন—ওটা খুব দামী চাল দিয়েছিলেন আপনি একটা,

ভেরি গুড স্ট্রোক—কিচ্ছু বেগ পেতে হয় নি আমাকে, যার কাছে চেয়েছি সে-ই দিয়েছে—

—চাঁদা ক'রে তুললেন নাকি ?

—ভিক্ষে ! বামুনের ছেলের ভিক্ষে করতে তো লজ্জা নেই ! তবে বেশী লোকের কাছে যেতে হয় নি। ওপারের সৌরীনবাবু, জমিরুদ্দিন, হীরালালবাবু, এ-পারের নন্দীমশায় আর বদি চাটুজ্যে, এক-শ টাকা ক'রে দিয়ে দিলাম প্রত্যেকে, মিটে গেল। আপনি একটা রসিদ দিয়ে দিন আমাকে, আর আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—নিশ্চয়ই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—পাশের বাড়ীর টাইফয়েডটা কি আপনার চিকিৎসাতেই ছিল ?

—ভূধরবাবুও দেখছিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—মর্ফিয়াটা খুব ডেন্‌জারাস ওষুধ না কি ?

আমাদের সব ওষুধই ডেন্‌জারাস্ ! কিন্তু কি করা যায় বলুন, সিরামটা পাওয়া গেল না, একটা কিছু তো করতে হবে, তাছাড়া মর্ফিয়া তো এর ওষুধই।

বদিবাবু কিছু বলিলেন না, গম্ভীরভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন। ভাবটা যেন আমি তর্ক করিতে চাহি না, কিন্তু মর্ফিয়াটা না দিলেই যেন ভাল করিতেন !

—ওরা কান্নাকাটি করছে না, সব চুপচাপ যে ?

—ভোরের ট্রেনে সবাই দেশে চলে গেছে।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—ক'টা রুগী মরল আপনার হাতে ?

বিমল হাসিয়া উত্তর দিল—বেশী নয়, গোটা-তিনেক—

—সহস্রমারী হ'তে এখনও দেরি আছে তাহলে! আচ্ছা, চলি এখন আমি! ভাল কথা, ও ব্যাপারটার কি করবেন ঠিক করলেন?

—কোন্ ব্যাপারটা

—থিয়েটারের?

—থিয়েটার করতেই হবে।

—করতেই হবে? না করলে কি হয়?

—এখন পিছনো অসম্ভব।

—ওষুধের বখেড়া মিটে গেল, আবার ওসব কেন! আপনাকে নিজেদের দলে টেনে রাখবার জন্যেই নন্দী টাকাটা দিয়েছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আমি তো আপনাদের দলেরই।

—তবু কি দরকার ওঁর মনে একটু ধোঁকা ধরিয়ে দেবার?

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

বদিবাবু বলিলেন—তাহলে বলি গে নন্দীকে যে থিয়েটার আর আপনি করতে যাবেন না, কি বলেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—মাপ করুন আমাকে, অমরকে কথা দিয়ে ফেলেছি; বিমল চাটুয্যের কথার আজ পর্য্যন্ত কখনও নড়চড় হয় নি।

বদিবাবু কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—এ চালটা মন্দ দিলেন না তো, অল রাইট—

মৃদু হাসিয়া বদিবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে এক পেয়ালা চা পান করিয়া বিমল বাহির হইল। একটু দূরে গিয়াই নজরে পড়িল পাড়ার রমেশ মোক্তার ও প্রতাপ

ডাক্তার তাঁহাদের সনাতন চৌকিটিতে বসিয়া প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। রমেশবাবুও আর মোক্তারি করেন না, প্রতাপবাবুও আর ডাক্তারি করেন না। প্র্যাকটিসের চূড়ান্ত করিয়া প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে উভয়েই এক দিন একযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এইরূপ জনশ্রুতি। উভয়েই প্র্যাকটিস-জীবনে সত্য-মিথ্যা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিচার করিয়া অকারণ সময় নষ্ট করেন নাই—অবহিতচিত্তে উপার্জ্জনই করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ব্যাঙ্কে উভয়েরই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ লাখের কোঠায়। চরিত্র দুইটি কিন্তু অদ্ভুত। ইঁহাদের যে বিদ্যাবুদ্ধি অথবা অর্থ আছে তাহা আপাত দৃষ্টিতে বোঝা অসম্ভব। আধ-ময়লা কাপড় পরিয়া নগ্নগাত্র বৃদ্ধ দুটি সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া অতিশয় উষ্মাভরে অতিশয় বাজে বিষয়ে প্রতিদিন কেবল তর্ক করেন। প্রতাপবাবু গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, পাকা গোঁফদাড়ি আছে; রমেশবাবু ঠিক উল্টা, কুচকুচে কালো, বেঁটে এবং মাকুন্দ। গলার স্বরও দুই জনের দুই রকম। প্রতাপবাবু উদারায় এবং রমেশবাবু তারায় বাঁধা। তর্কের পদ্ধতি এবং বিষয় বিচিত্র। অথচ দুই জনে পরম বন্ধু।

প্রতাপবাবু হয়ত তাঁহার বাজখাঁই গলায় বলিলেন—পটলের দরটা কমছে ক্রমশ, কাল দশ পয়সা হয়েছিল।

মিহি অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রমেশবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিলেন—বাজে কথা কাল তিন আনা দর ছিল।

—বিশু কি তাহলে মিছে কথা বল্লে বলতে চাও, বিশু, বিশু—

ভৃত্য বিশু আসিয়া দাঁড়াইল।

—কাল পটলের সের কত ক'রে ছিল?

—আজ্ঞে দশ পয়সা

—শুনলে তো, আচ্ছা যা। বিশু চলিয়া গেল।

রমেশবাবু বলিলেন—বাজে কথা, বিশ্বাস করি না। হয়ত পচা বা ছোট জিনিস এনেছে।

—বিশু, বিশু—

বিশু পুনরায় আসিল।

—কাল যা পটল এনেছিস নিয়ে আয় তো।

বিশু পটল লইয়া আসিল, দেখা গেল পটল ভালই।

রমেশবাবু তখন অন্য পথ ধরিলেন। বলিলেন—বিপিনের কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। তোমার বিশু হয়ত অন্য জিনিষে দু-পয়সা মেরেছে, পটলেব বেলায় মিথ্যে করে শস্তা দেখিয়ে ভালমানুষ সাজছে! আমার বিপিন—

—তোমার বিপিনটি একটি চোর, ওই ডোবাবে তোমায়।

অতঃপর তর্কের বিষয় আর পটল রহিল না, বিপিন চোর, না বিশু চোর ইহাতে পর্য্যবসিত হইল। তাহার পর ক্রমশঃ সাধুতা কি, অসাধুতা কি, তাহার পর রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণ, ক্রমশঃ বেদ-বেদান্ত—এই ভাবেই রোজ চলে। রোজই একটা তুচ্ছ বিষয় হইতে সুরু হইয়া বিষয়ান্তরে উপনীত হয় এবং ক্রমশঃ তুমুল হইতে তুমুলতর হইতে থাকে। রমেশবাবু এবং প্রতাপবাবু বাল্যবন্ধু শৈশবে একসঙ্গে খেলা করিয়াছেন, পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াছেন, একসঙ্গেই এক জন ডাক্তারি এবং এক জন মোক্তারি পাস করিয়াছেন, একসঙ্গে একদা গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস্ ত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে প্রত্যহ একসঙ্গে বসিয়া তর্ক করেন। কাহারও সঙ্গে কাহারও মতের বিন্দুমাত্র মিল নাই, তথাপি কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকিতে পারেন না। ঐ পুরাতন কাঠের চৌকিটিতে উপবেশন করিয়া একটা-না

একটা কিছু লইয়া উভয়ে দিনের পর দিন কলহ করিয়া চলিয়াছেন। লোকে ইহাদের নাম দিয়াছে 'মাণিকজোড়'।

বিমলের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে ইহাদের মৌখিক আলাপ মাত্র হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু নয়।

আজ সহসা প্রতাপবাবু বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু রমেশের বগলের এই ফোড়াটা দেখুন তো পেকেছে কি না?

রমেশবাবু তীব্র প্রতিবাদ করিলেন—কি মুশকিল, আমার ফোড়া আমি বুঝতে পারছি না, বলছি পাকে নি।

—আহা, ডাক্তারবাবুকে দেখতেই দাও না।

—দেখুন, বেশী টিপবেন না যেন।

বিমল দেখিয়া বলিল—প্রায় পেকেছে।

প্রতাপবাবু বলিলেন—ওই দেখ।

রমেশবাবু বলিলেন—প্রায় পেকেছে, আর পেকেছে, এক কথা নয়, দেখব আবার কি?

—আমি বলছি তুমি তোকমারি দাও।

তোকমারি দেওয়ার অবস্থা এখনও হয় নি, পুঁই পাতায় গরম ঘি লাগিয়ে আরও দু-এক দিন বেঁধে রাখতে হবে।

বিমল বলিল—কেটে দিলেই চুকে যায়।

রমেশবাবু বলিলেন—আপনি সরে যান তো মশায়।

বিমল একটু হাসিয়া পরেশ-দার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বেশ আছে এই বৃদ্ধ দুইটি। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে সংসার চলে এবং সময় কাটাইবার জন্য তর্ক আছে, নাই বা থাকিল সে তর্কের মাথামুণ্ড, সময় ত কাটে!

পোষ্টাফিসে যাইবা মাত্র পরেশ-দা বলিলেন—এই নাও মণিমালার চিঠি!

পরেশ-দা পুনবায় বলিলেন—খুব যদি উত্তেজিত না হয়ে ওঠ তাহলে ঐ কোণের টুলটায় ব'সে পড়তে পার, হরেন ততক্ষণ চা করুক।

বিমল হাসিয়া বলিল—উত্তেজিত হলেই বা কি?

—টুলটা মজবুত নয়, তাছাড়া কাছেই কালির বোতলটা রয়েছে।

বিমল হাসিয়া টুলটিতে উপবেশন করিয়া পত্রখানি খুলিল।

—তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তুমি কিন্তু আমার চিঠির একটি কথারও উত্তর দাও নি, ভাল প্যাডও কেন নি। একটু ভালবাস না তুমি আমায়। ওখনকার বাড়ীটা কেমন, কিছু লেখনি, 'বাথরুম' আছে ত? গঙ্গার ঘাট থেকে কত দূর, পাড়াপড়শীরা কেমন লোক, সব লিখো এবার। তোমাদেব সিভিল সার্জনের মেয়ে তরঙ্গিণী আমাদের সঙ্গে 'পড়ত' একসঙ্গেই পরীক্ষা দিলাম এবার। সে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী গেছে, এখন ঐখানেই থাকবে। আমি গেলে এবার তার সঙ্গে দেখা করব, কেমন! আমি কিন্তু এ মাসটা এখানে থাকতে চাই। এ ক'মাস তো পবীক্ষা পরীক্ষা করেই কেটেছে, সিনেমা-টিনেমা কিছুই দেখা হয় নি। এবার তো কলকাতা থেকে নির্ব্বাসন হবে, তার আগে একটু ফুর্ত্তি ক'রে নেওয়া যাক। তুমি আসতে পারবে কি? এলে বেশ হ'ত। না যদি আসতে পার অন্ততঃ গোটা-কুড়ি টাকা আমাকে পাঠিও, মা বাবার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করে। এত দিন ত ওঁরাই সব খরচ দিয়েছেন, বিয়ে হবার পরও কত টাকা দিয়েছেন, আর কিন্তু নেব না। টাকা তুমি নিশ্চয় পাঠিও। আমার মাকে চিঠি লেখ না কেন তুমি? আমার চিঠি পাওয়া মাত্র তাঁকে ভাল ক'রে একখানা চিঠি দেবে, নইলে তোমার চিঠি আমি চাই না। মা অবশ্য মুখে কিছু বলেন না,

কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হন তা বুঝতে পারি। আমাকে খালি খালি চিঠি দাও অথচ আর কাউকে দাও না, এমন লজ্জা করে আমার, মাকে নিশ্চয় চিঠি দিও।

তোমার প্র্যাকটিস ওখানে একটু একটু বাড়ছে শুনে সুখী হলাম। কত টাকা জমালে? আমার কিন্তু একটা জিনিসের সখ আছে, তাবিজ এক জোড়া, সেটা বুড়ো হবার আগে চাই। দেবে তো?

তোমার বন্ধু অমরবাবুর স্ত্রী বিনোদিনীকে চিনি আমি। লরেটোর মেয়ে, খুব সুন্দরী। ওদের তো "লভ্ ম্যারেজ"—মেয়েদের মধ্যে ওদের দু-জনকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। রাগ ক'রো না, কিন্তু তোমার বন্ধুটি লোক মোটেই ভাল নন। বেশী মিশো না তুমি ওঁর সঙ্গে। বিনোদিনী এসেছিলো নাকি তোমার বাসায় এক দিন? বেশ চমৎকার দেখতে, নয়? আমার চেয়ে ঢের ভালো। কি কি গল্প করলে তার সঙ্গে লিখো। মেয়েটি লেখাপড়াতেও খুব ভাল। অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছে।

অনেক বাজে কথা লিখে কাগজ ভরালাম। এইবার উঠি, সন্ধ্যের 'শো'তে 'ওয়ে অব অল ফ্লেশ' দেখতে যাব। শুনেছি খুব ভাল হয়েছে নাকি বইখানা। পপি আমার টেবিলের নীচে ব'সে পায়ের তলায় সুড় সুড়ি দিচ্ছে। পপিকে মনে আছে ত? আমার সেই ছোট্ট লোম-ওলা কুকুরটা এমন সুন্দর হয়েছে আজকাল। আমি কিন্তু পপিকে নিয়ে যাব, ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।...

পরেশ-দা বলিলেন—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে ভায়া।

বিমল চিঠিটা মুড়িয়া পকেটে রাখিল এবং গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া একটা চুমুক দিল।

পরেশ-দা বলিলেন—কি হে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন, দুঃসংবাদ নাকি কিছু ?

—না।

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল চা পান করিতে লাগিল। যোগেন বসিয়া চিঠি সর্ট করিতেছিল, সে বিমলের হাতে আর একখানি চিঠি দিল। এখানি একটি পোষ্টকার্ড। পিতৃবন্ধু নিবারণবাবু লিখিয়াছেন, "তোমার পৈতৃক জমির খাজনা প্রায় চল্লিশ টাকা বাকী পড়িয়াছে। টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া খজনাটা শোধ করিয়া দিও। ভাল ভাল জমি, বাকী খাজনার দায়ে যেন নিলাম না হইয়া যায়।" মণিমালার জন্য অবিলম্বে কুড়ি টাকার এবং অনতিবিলম্বে বাজুর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জমির খাজনার জন্যও চল্লিশ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুইটি চিঠিরই মর্ম্ম—টাকা চাই। বিমল উঠিয়া পড়িল।

পরেশ-দা বলিলেন—এর মধ্যেই উঠছ যে ?

—বাঃ, হাসপাতাল যেতে হবে না, সাতটা তো বাজে।

—হাসপাতালে ওষুধের কিছু হ'ল ?

—এই যে।

বিমল পাঁচ শত টাকার চেকটা পরেশ-দা'কে দেখাইল। সমস্ত শুনিয়া উল্লসিত পরেশ-দা বলিলেন—বলেছিলাম তো তোমাকে আগেই, বদিবাবু ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। থিয়েটার আর করছ না তা হ'লে ?

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—করছি। বদিবাবুকে বলেছি সব।

—তার মানে ?

—পরে বলব, আপনি কাজ করুন্।

—না, না ব'লে যাও ভাই—পরেশ-দা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

অগত্যা বিমলকে সংক্ষেপে সব কথা বলিতে হইল। সমস্ত শুনিয়া পরেশ-দা বললেন—নন্দী কিন্তু চটবে।

—দেখা যাক।

বিমল হাসপাতালে পৌঁছিয়া দেখিল একমুখ হাসি লইয়া সেই বুড়ী বসিয়া আছে। ইন্‌জেকশন লইয়া তাহার মাথাধরা সারিয়া গিয়াছে। শরীরের সমস্ত বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে—উঃ কি ভীষণ নীল বিষ!

৯

ইলেক্‌ট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে ভাল একটি প্রবন্ধ বিমলকে লিখিয়া দিতেই হইল—নন্দী-মহাশয়কে তুষ্ট করিবার আর কোন উপায় সে ভাবিয়া পাইল না। নন্দী মহাশয় খানিকটা তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু মথুরবাবুর দলকে কিছুতেই বাগাইতে পারিলেন না। শহরে ইলেক্‌ট্রিসিটি আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা কর্জ্জ লওয়া হউক—এ প্রস্তাব কিছুতেই পাস হইল না। এই দরিদ্রদেশের পক্ষে ইলেক্‌ট্রিসিটি বর্ত্তমান অবস্থায় যে কিরূপ ব্যয়সাপেক্ষ তাহা মথুরবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন—এদেশে ভগবানের কৃপায় এখনও আলোক অথবা বাতাসের অভাব হয় নাই, এদেশে এখনও অভাব অন্নের, শিক্ষার, চিকিৎসার। এদেশের প্রতি ঘরে ঘরে ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত অসহায় লোক যে-অন্ধকারে বাস করিতেছে ইলেট্রিক আলো জ্বালিয়া সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে না। ইলেক্‌ট্রিসিটি আসিলে বিলাসপরায়ণ দুই-দশ জন ধনীর হয়ত সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই ইহা অসুবিধা ও অশান্তির কারণ হইবে। দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ত্তমানে ইলেক্‌ট্রিসিটি আনিবার প্রস্তাব সুতরাং অন্যায় এবং হাস্যকর।

নন্দী ভোটে হারিয়া গেলেন। তিনি আরও ক্লিষ্ট হইলেন যখন তিনি শুনিলেন যে মথুরবাবু নিজব্যয়ে তাঁহার নিজের বাড়ীতে 'ডাইনামো' বসাইতেছেন। নন্দী-মহাশয়ও যে নিজব্যয়ে বাড়ীতে একটা ডাইনামো বসাইতে পারেন না তাহা নয়, কিন্তু এখন বসাইতে গেলে সকলে বলিবে যে তিনি মথুরবাবুর নকল করিতেছেন। প্রাণ থাকিতে তিনি এ অপবাদ সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি যেমন করিয়াই হউক মিউনিসিপালিটির সাহায্যেই শহরে ইলেকট্রিসিটি আনাইবেন। নিজে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া একা বৈদ্যুতিক আলো হাওয়া ভোগ করিব এবং বাকী সকলে দারিদ্র্য-নিবন্ধন কষ্ট পাইবে, মথুরবাবুর মত এত বড় স্বার্থপর নন্দীমহাশয় নহেন। মুখে না বলিলেও বিমলের উপর নন্দীমহাশয় মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। নূতন ডাক্তারবাবুটি রোজই নাকি ওপারে গিয়া থিয়েটারের মহড়া দিতেছেন। বদিবাবু তাঁহার চাটুয্যে-প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া এই লোকটিকে আনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছে যে খাল কাটিয়া কুমীরই বোধ হয় আনা হইয়াছে। আসিতে না আসিতে ছোকরা সোজা গিয়া মথুরবাবুর দলে ভিড়িয়া পড়িল। লোকটি এদিকে কথায়-বার্ত্তায় দেখিতে শুনিতে ভালই, চিকিৎসাও মন্দ করে না, হাসপাতালের কাজকর্ম্মের সুখ্যাতি সকলেই করিতেছে, রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে—কিন্তু ছোকরা যদি বিভীষণ হয় তাহা হইলে ত বড় মুশকিলের কথা। মথুর মুখুজ্যেদের সঙ্গে এতটা মাখামাখি মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। বিমলের প্রতি নন্দী-মহাশয়ের মনোভাব ক্রমশই হয়ত আরও বিরূপ হইয়া উঠিত, কিন্তু দুইটি কারণে তাহা আর হইল না। মিউনিসিপালিটির ও হাসপাতাল-কমিটির মেম্বার হরেন বোসের উপর নন্দী-মহাশয় চটা। লোকটা কন্ট্র্যাকটারি করিয়া হঠাৎ বড়লোক হইয়াছে এবং হঠাৎ বড়লোক

হইলে যাহা হয় হরেন বোসের ঠিক তাহাই হইয়াছে। আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইলে আঙুল ও কলাগাছ উভয়েরই মর্য্যাদা নষ্ট হয়। গরিবের ছেলে স্বল্প-শিক্ষিত হরেন বোস টাকার জোরে হঠাৎ সবজান্তা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি আর্ট, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য সমস্তই তিনি বুঝিতেছেন এবং সব বিষয়েই অসঙ্কোচে মোসাহেব-মহলে মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। যে বস্তুটি থাকিলে মানুষের সঙ্কোচ হয়, সে বস্তুটি তাঁহার নাই। তাঁহার অভিমত শিক্ষিত-সমাজে হয়ত গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু শিক্ষিত সমাজকেই কি তিনি গ্রাহ্য করেন? তিনি যাঁহাদের এবং যাঁহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন, সেই সমাজে বাহবা পাইলেই যথেষ্ট। বাহবা পানও। :লোকচরিত্র সম্বন্ধেও তাঁহার বিচার দ্বিধা-বিহীন। নন্দী-মহাশয় ভণ্ড, বদিবাবু চতুর, মথুরবাবু ঘুঘু, ডাক্তারটা চালিয়াৎ, পোস্টমাস্টার খোসামুদে, জগদীশবাবু অর্থপিশাচ, ভূধরবাবু তুখোড়—সকলের সম্বন্ধেই হরেনবাবুর অভিমত পাকা। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা-বলে তিনি সকলেরই আদি-অন্ত নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। একটি মাত্র লোককে তিনি একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তিনি চৌধুরী-মহাশয়। কনট্র্যাকটারির জন্য মাঝে মাঝে টাকার দরকার হইয়া পড়ে এবং ঐ চৌধুরীই তাঁহাকে সে সময় সাহায্য করেন। অনেক সময়, সুদও গ্রহণ করেন না, বিনা হ্যাণ্ডনোটেও দুই-এক বার টাকা দিয়াছেন। এ বাজারে এ রকম লোক বিরল—ইহাই হরেন বোসের ধারণা। হরেন বোসের সহিত বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর সুতরাং বন্ধুত্ব আছে এবং এই দুই জনকে কেন্দ্র করিয়া একটি নাতিক্ষুদ্র দলও মিউনিসিপালিটিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলটি নন্দী-মহাশয় অথবা মথুরবাবুর দলের সহিত একমত নহে, যখন যে-দলে ভোট দিলে নিজেদের সুবিধা হইবে সেই দলেই ইহারা সাধারণতঃ যোগদান করেন। কখনও নন্দী-মহাশয়ের

দলে, কখনও মথুরবাবুর দলে, যেখানে যখন সুবিধা। ভোটের লোভে নন্দী-মহাশয় এবং মথুরবাবু উভয়েই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তাই এ দলটিকে প্রশ্রয় দেন। যুদ্ধে ভোটই যেখানে প্রধান অস্ত্র, সেখানে এতগুলি ভোটের আনুকূল্য পাওয়া কম কথা নহে। বোস-চৌধুরীর দলে কিন্তু কয়েক জন দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক আছেন, নানা ভাবে তাঁহারা নাকি সহজে প্রলুব্ধ হন। নন্দী-মহাশয়ের দলের প্রধান পাণ্ডা বদিবাবু সে খবরটি রাখেন এবং বেগতিক দেখিলে ঐ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক-গুলির দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বল-বৃদ্ধি করেন। কি ভাবে তাঁহারা প্রলুব্ধ হন তাহা সকলেই জানে, অথচ কেহ কিছু বলে না। আমরাও তাহা ব্যক্ত করিয়া অকারণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে চাহি না। তবে এটা ঠিক কথা, এই দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকগুলি না থাকিলে বিমলের এখানে আসা সম্ভবপর হইত না। এই বোস-চৌধুরী দলেরই কতকগুলি লোককে গোপনে ভাঙাইয়া বদিবাবু জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই ইলেকট্রিসিটি ব্যাপারেও বদিবাবু যদি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিতেন কি হইত বলা যায় না, কিন্তু বদিবাবুর নিজেরই ইহাতে অমত ছিল। ভোট দিবার বেলায় যদিও তিনি নন্দী-মহাশয়ের দিকে ভোট দিয়াছিলেন, কিন্তু বোস-চৌধুরীর দল ভাঙাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি যে এ কার্য্য করিতে পারেন তাহা এক তিনি এবং ঐ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক কয়টি ছাড়া আর কেহ জানে না। এই লোকগুলি যদিও বোস-চৌধুরী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু নিজেদের তাঁহারা কোন দলের সহিত একীভূত করিতে চান না, নিজেদের তাঁহারা স্বাধীনচেতা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বোস-চৌধুরীর দলই অধিকাংশ সময়ে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দেন বলিয়া সাধারণতঃ এই দলে যোগদান করেন। স্বাধীনচিত্ততার ব্যতিক্রম

দেখিলে অন্য দলে যাইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। মিউনিসিপালিটির দলাদলির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হরেন বোস এবং তাঁহার দল ইলেকট্রিক স্কীমের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, তাহার কারণ হরেন বোস নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি এই ইলেকট্রিক কনট্র্যাক্‌ট্ পাইবেন না, পাইবেন রমেন নন্দী, নন্দী-মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র! এই অকর্ম্মণ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কোন একটা রোজগারের পন্থায় চালু করিয়া দিবার জন্য নন্দী-মহাশয় বহু কাল হইতে সচেষ্ট আছেন। এ কার্য্যে তাঁহাকে আর যে-ই সহায়তা করুক, হরেন বোস করিবেন না তাহা ঠিক।

নন্দী সুতরাং হরেন বোসের উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন যখন সেই হরেন বোসই বিমলবাবু ডাক্তারের নামে এই অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইলেন যে অতি সামান্য দোষে এই ছোকরা ডাক্তারটি হাসপাতালের এতকালের পুরাতন পাচক শিবু ঠাকুর এবং পুরাতন ভৃত্য ভৈরবকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ভৃত্য ভৈরবের জন্য যতটা না হউক, শিবু ঠাকুরের পদ-চ্যুতিতে হরেন বোসের মর্ম্মাহত হইবার সঙ্গত কারণ আছে বইকি। কারণটি প্রকাশ করিয়া বলিবার মত নহে।; কিন্তু শহরের কে না এ কথা জানে! সেই শিবু ঠাকুরের চাকরি গিয়াছে, বিমলবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে—নন্দী-মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বিমলের প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতা সহসা যেন খানিকটা কমিয়া গেল। মুখে অবশ্য তিনি হরেনবাবুকে বলিলেন তাই নাকি, ছেলেমানুষ কি না, মাথা একটুতেই গরম হয়ে যায়, আচ্ছা আমি বলব ওঁকে। বসুন—ওরে ডাব নিয়ে আয়।

হরেনবাবু কিন্তু বসিলেন না, চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই বদিবাবু আসিলেন। তিনি কোর্টে যাইবার বেশে সজ্জিত ছিলেন, আসিয়াই বলিলেন—দেখুন, আমাদের মিটিঙের দিনটা পেছিয়ে দিন, বাজেট-মিটিং, ওটাতে আমার থাকা দরকার—

—আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

—আমি আজ বেরিয়ে যা'চ্ছি, থার্ডের আগে ফিরতে পারব না! সদরে দুটো কেসও আছে' তাছাড়া ঐ অঞ্চলে আমার কিছু জমি আছে তা নিয়ে কি সব গোলমাল হয়েছে প্রজাদের সঙ্গে, সেটা মিটিয়ে ফেলতে চাই!

নন্দী-মহাশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বাজেট-মিটিঙে বদিবাবু না থাকিলে তিনি একেবারে নিঃসহায়, অথচ মিটিঙের তারিখও বদলানো অসম্ভব, নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। শেষ মুহূর্ত্তে বদিবাবু এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ও ঠোঁটের উপর তর্জ্জনীটি স্থাপন করিয়া বদিবাবু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

—তারিখ বদলানো অসম্ভব তাহলে ?

—কি ক'রে হয় বলুন ?

—আচ্ছা বেশ, যাতে সেদিন 'কোরাম' না হয় সে ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি। আপনি চেয়ারম্যান, আপনি না গেলে ভাল দেখায় না, কিন্তু কেবল আপনি যাবেন আমাদের দলের আর কেউ যাবে না। ও-পারের সতীশ, জমিরুদ্দিন, হীরালাল ওদের মানা ক'রে যাচ্ছি, কেউ আসবে না।

—মথুরবাবুর দলটি তো আসবে ?

—ওদেরও দু-চার জনকে আটকাবার ব্যবস্থা করছি। ঠিক হয়েছে, মথুরবাবুর দলের জন-চারেক থিয়েটার নিয়ে মেতেছে, আমাদের

ডাক্তারও তো আছে ওর ভেতর, ওকেই টিপে দিয়ে যাই রিহার্শাল-ফিয়ার্শলে কোন একটা ছুতোয় আটকে রাখবে এখন ওদের সেদিন সন্ধ্যেবেলায়! ডাক্তার ওদের মধ্যে গিয়ে বেশ জমিয়েছে শুনছি—

নন্দী-মহাশয় ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেটা কিন্তু আমি খুব সুসংবাদ ব'লে মনে করি না।

বদিবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িলেন—মনে করেন না মানে?

—মথুরবাবুর সঙ্গে অত ঢলাঢলি ভাল লাগে না মশাই!

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না, ডাক্তার ওখানে গিয়ে এক হিসেবে আমাদের কত সুবিধে হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না? আমি তো এ যোগাযোগটাকে খুব ভাল ব'লে মনে করি, বিমলবাবু ব'লেই পেরেছেন।

—কি রকম বলুন তো?

—বিপক্ষের শিবিরে নিজেদের একটা স্পাই থাকা মন্দ কি?

নন্দী মহাশয় জিনিষটাকে এভাবে একবারও ভাবেন নাই। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নন্দী-মহাশয় রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন—তাহলে কি বলতে চান—

ঘাড় নাড়িয়া বদিবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ওই। কথাটা কাউকে বলি নি, আপনিও যেন ঘুণাক্ষরে কাউকে বলবেন না, পাঁচ কান হ'লে আবার —! বিমলবাবুকেও বলবেন না যেন—

—না না, পাগল!

—আচ্ছা এবার উঠি তাহলে আমি।

বদিবাবু চলিয়া গেলেন। সামান্য একটি ক্ষুদ্র মিথ্যার প্রভাবে নন্দী-মহাশয়ের মন নির্মেঘ হইয়া গেল, বিমলের উপর তাঁহার যে

অপ্রসন্নতাটুকু ছিল তাহা আর রহিল না। বরং তিনি ভাবিতে লাগিলেন—অতিশয় চতুর ছোকরা তো। থিয়েটারের অজুহাতে বেশ সুড়ঙ্গ কাটিয়া ঢুকিয়াছে! অনির্ব্বচনীয় স্নেহরসে নন্দী-মহাশয়ের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ইহার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আকস্মিকভাবে একটা ঘটনা ঘটিল। বৈকালে বিমল হাসপাতালে কাজ করিতেছিল। গত রাত্রে ভারি সুন্দর একটা রোগী আসিয়াছিল, তাহারই রক্তের স্লাইডগুলি বিমল আর এক বার দেখিতেছিল। কাল রাত্রে ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় এই সাঁওতাল রোগীটিকে পাঠাইয়াছিলেন। লোকটা থার্ডক্লাস একটা গাড়ীতে অজ্ঞান অবস্থায় রক্ত-মাখামাখি হইয়া পড়িয়া ছিল। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। নিশ্চয়ই কেহ ইহাকে খুন করিয়া গিয়াছে, সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল। বিমলও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার গায়ে কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই, রক্ত পড়িয়াছে নাক হইতে। সমস্ত গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। রাত্রেই রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—ম্যালেরিয়া। সহজ ম্যালেরিয়া নয়, ম্যালিগন্যান্ট্ ম্যালেরিয়া, সাংঘাতিক জিনিস। রাত্রেই সে একটি কুইনাইন ইন্জেকশন দিয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রোগী উঠিয়া বসিয়াছে। বলিতেছে যে গাড়ীতেই তাহার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহার পর কি হইয়াছে সে জানে না। সম্ভবতঃ জ্বরের ঘোরে সে বেঞ্চি হইতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলেই রক্তপাত ঘটিয়াছে। বিমল উত্তর দিকের বারান্দায় বসিয়া রক্তের স্লাইডগুলি আর এক বার দেখিতেছিল, এমন সময় গুপি-বাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, সিভিল সার্জ্জন আসছেন—

বিমল সিভিল সার্জনকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই।

উঠিয়া আসিয়া দেখিল খাকি হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা একটি বাঙালী সাহেব একটি চামড়া দিয়া বাঁধানো সরু বেত আস্ফালন করিতে করিতে জগদীশবাবুর সহিত এই দিকেই আসিতেছেন—তাঁহার গোঁফ দুই দিকে কামানো, কিন্তু পাকা, কানের পাশের চুলেও পাক ধরিয়াছে, চোখে মুখেও বার্দ্ধক্যের সুস্পষ্ট ছাপ, কিন্তু চলনে বলনে বেশ একটা চটুলতা আছে। বার্দ্ধক্যটাকে অস্বীকার করিয়া একটু যেন বেশী জোরে হাঁটিতেছেন, বেশী জোরে হাসিতেছেন, বেতের সরু ছড়িটাকে একটু বেশী জোরে ঘুরাইতেছেন। বিমল নমস্কার করিতেই জগদীশবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন—ইনিই আমাদের নূতন ডাক্তার, আর ইনি আপনাদের সিভিল সার্জন।

সিভিল সার্জন রিষ্টওয়াচটার দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—চলুন আপনার হাসপাতাল দেখি।

ইনডোরে ঢুকিয়া বলিলেন—ইনডোর তো আপনার ভর্ত্তি দেখছি, দ্যাট্স্ গুড্—

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুই-একটা টিকিট দেখিলেন।

—অধিকাংশই কালাজ্বর দেখছি, এ-সব রক্ত পরীক্ষা আপনি নিজেই করেন নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজেরই মাইক্রসকোপ আছে।

—দ্যাট্স্ গুড্।

—ম্যালেরিয়া এ-অঞ্চলে কেমন পান? খুব, নয়?

—কালই তো একটা পেয়েছি।

বিমল সাঁওতাল রোগীটির ইতিহাস বলিল এবং স্লাইড দেখাইল, দেখিয়া শুনিয়া সিভিল সার্জন খুশী না হইয়া পারিলেন না। তাঁহার খুশী ভাবটা লক্ষ্য করিয়া জগদীশ-বাবু বলিলেন—যথেষ্ট পরিশ্রম

করেছেন উনি হাসপাতালের জন্যে, আমরা ওঁকে ওষুধ দিতে পারছি না এই হয়েছে এক মুশকিল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—এতগুলো কালাজ্বর কেসের ইনজেকশন কোথায় পাচ্ছেন ?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমল বলিল—নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিচ্ছি, কি আর করব! বদিবাবু কিছু টাকা চাঁদা করে তুলে দিয়েছেন, ওষুধ আনতে দিয়েছি কিছু—

সিভিল সার্জন ও জগদীশবাবুর একটা দৃষ্টিবিনিময় হইল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—ভেরি গুড, চলুন আপনার আউটডোর রেজিষ্টারটা দেখি।

রেজিষ্টারে দেখা গেল রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

সিভিল সার্জন তাহার পর বাহিরে হইতেই এক বার, সার্জিকাল আলমারিটাতে উঁকি দিলেন।

—ছুরি-কাঁচিগুলিতে ঠিকমত ভ্যাসিলিন দেওয়া হয় তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দ্যাটস্ গুড। রবার টিউবগুলো অমন ক'রে না রেখে কেরোসিন ডেপারে রেখে দেবেন। একটি টিনের বাক্স করিয়ে নেবেন, তার মাঝে একটা ফুটোফুটোওলা পার্টিশন থাকবে—নীচে খানিকটা কেরোসিন তেল রেখে দেবেন আর উপরে ঐ টিউবগুলো। আচ্ছা, কোকেন কতটা আছে দেখি—

কোকেন দেখা ও ওজন করা হইল—ঠিক আছে।

সিভিল সার্জন গুপিবাবুকে একটা ধমক দিলেন—তোমার নিক্তি এত ময়লা কেন, আজই পরিষ্কার করবে।

—যে আজ্ঞে।

সিভিল সার্জন বাহির হইয়া আসিয়া বিমলকে প্রশ্ন করিলেন—আপনার ইনডোরে কি একটা ফিমেল কেস সম্প্রতি মারা গেছে?

—হ্যাঁ, নিমোনিয়া হয়েছিল।

—হার্টটা ফেল করল শেষকালে বুঝি?

—হ্যাঁ, ভয়ও পেয়েছিল হঠাৎ।

বিমল ভিখারীর ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

সিভিল সার্জন জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তাহলে বেনামী চিঠিতে যা লিখেছে তা একেবারে মিছে কথা নয়। ওরকম ভিকিরি-টিকিরিকে আর আশ্রয় দেবেন না, আর হাসপাতালে নার্স যখন নেই, তখন রোগীর শুশ্রূষা করবার মত আত্মীয়স্বজন না থাকলে ভর্ত্তিও করবেন না। অনর্থক বদনাম হয়। আপনার নামে এক বেনামী চিঠি গিয়ে হাজির এক দিন আমার কাছে, আচ্ছা আপনার ভিজিটার্স বুকটা বার করুন।

বিমলের কথায়-বার্ত্তায় কার্য্যে সিভিল সার্জ্জন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—বেনামী চিঠি সত্ত্বেও বিমলের প্রশংসাসূচক মন্তব্যই করিলেন। তাহার পর হাত-ঘড়িটা আর এক বার দেখিয়া বলিলেন—জগদীশ চল তোমার কেসটা এবার দেখা যাক্।

জগদীশ কেমন যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন—চল।

উভয়ে চলিয়া গেলেন!

সেদিন রাত্রে গুপিবাবুর বাসায় বসিয়া হরেন বোস সাগ্রহে সিভিল সার্জনের আগমন-বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু খুব খুশী হইলেন না। বেনামী চিঠি লিখিয়া লোকটাকে জব্দ করা গেল না তো!

১০

হরেন বোসের সহিত বিমলের শত্রুতা ত ছিলই, আরও একটি শত্রু বৃদ্ধি হইল। স্টেশন-মাষ্টার ঘোষালবাবুর সহিতও সদ্ভাব রক্ষা করা বিমলের পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না। বেঁটে ভুঁড়ি-সর্ব্বস্ব এই লোকটির উপর বিমলের তাদৃশ শ্রদ্ধা গোড়া হইতেই ছিল না। রেলের ডাক্তার জগুবাবুর সহিত আলাপ হইবার পর হইতে বিমল ঘোষালবাবুর উপরে চটিয়াছে। ডাক্তার জগমোহন অতি অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক, গোলগাল মুখখানিতে সরলতা যেন মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বদাই সকলের উপকার করিবার জন্য ব্যস্ত। অত্যন্ত বেশী ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হয় জগুবাবু তাঁহার ন্যায্য মূল্য কাহারও নিকট হইতে পান না। অতিশয় সুলভ হইয়া তিনি সকলেরই নিকট যেন খেলো হইয়া রহিয়াছেন। জগুবাবুর সহিত দুই-একটি রোগীও বিমল ইতিমধ্যে দেখিয়াছে, ডাক্তার হিসাবে লোকটি মোটেই নিন্দনীয় নহেন, বরং নিরহঙ্কার এবং জগদীশবাবু, ভূধরবাবুর অপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক। অথচ এই জগুবাবুর নিন্দায় ঘোষাল শতমুখ। রেলের আইন-অনুসারে ঘোষাল বিনামূল্যে জগুবাবুর দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারেন কিন্তু সে চিকিৎসা পাইবার জন্য তাঁহাকে ত দুইমাইল দূরে যাইতে হইবে। হাতের কাছে যখন বিনামূল্যেই বিমলবাবুকে পাওয়া যাইতেছে তখন আর অত কষ্ট করিয়া লাভ কি। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তারের নিন্দা করিলে বিমলবাবু হয়ত খুশী হইবেন এই আশায় ঘোষাল সম্ভবতঃ জগুবাবুর নিন্দা করিয়া থাকেন। বিমল সবই বুঝিত, কিছু বলিত না। ঘোষালবাবুর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি, সুতরাং প্রায়ই বিমলকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হয়। ঘোষাল-গৃহিণীর যক্ষ্মা হয় নাই —হইয়াছিল কোলাই জ্বর (বি কোলাই ইনফেক্‌শন), ইনজেকশন লইয়া

ও ঔষধ পান করিয়া তিনি বিজ্বর হইয়াছেন। সুতরাং বিমলের প্রতি ঘোসালের বিশ্বাস আরও অগাধ হইয়াছে এবং কাহারও সামান্য সন্দিজ্বর হইলেও বিমলের ডাক পড়িতেছে। প্রায়ই বিমলকে হাসপাতালের ফেরৎ কিংবা হাসপাতাল যাইবার মুখে ঘোষালবাবুর বাড়ী যাইতে হইতেছে। ইহাতে এত দিন বিমল কিছুই মনে করে নাই, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। বৃষ্টিও বেশ অসাধারণ রকমের। এখানে আসিয়া অবধি এত জোরে, বৃষ্টি বিমল এক দিনও দেখে নাই। মেঘের যেমন গর্জ্জন তেমন বর্ষণ। এই বর্ষা-সন্ধ্যায় বিমল একা চুপচাপ বসিয়া ছিল। এই বৃষ্টিতে ওপারে রিহার্সাল দিতে যাওয়া অসম্ভব, হয়ত কেহই আসে আর নাই। সহসা তাহার নজরে পড়িল ঘরের একটা কোণ হইতে জল পড়িতেছে। তোরঙ্গটা ছিল সরাইয়া আনিল এবং যোগেনকে ডাকিয়া একটা বালতি কিংবা গামলা ঐ জায়গাটায় রাখিতে বলিল, সমস্ত ঘরটা তাহা না হইলে জলময় হইয়া যাইবে। যোগেন বলিল যে এবং পাশের ঘরে রান্নাঘরেও নাকি জল পড়িতেছে। ক্রমশঃ দেখা গেল দালানেরও উত্তর দিকটার ছাতে ফাটল, সেখান দিয়া বেশ প্রবলভাবেই জল পড়িতেছে। বাড়ীটা অবিলম্বে সারানো দরকার। কিন্তু হাসপাতালের ফাণ্ডের কথা চিন্তা করিয়া সে একটু দমিয়া গেল। নিরুৎসাহ ভাবটা কাটাইয়া ফেলিবার জন্য সে বলিল—স্টোভে তেল আছে?

—আজ্ঞে আছে।

একটু জল গরম ক'রে আন দিকি, পরেশ-দার কফি একটু খাওয়া যাক্, দুধও গরম কর এক পেয়ালা, চিনি আছে ত?

—আছে।

—কফি খেয়েছিস কখনো তুই ?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা খাওয়াচ্ছি তোকে, জল গরম কর তাড়াতাড়ি।

যোগেন মহাউৎসাহে জল গরমের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। মেডিকেল গেজেটখানা খুলিতে গিয়া সহসা তাহার ভিতর হইতে মণিমালার একখানা পুরাতন চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। পুরাতন চিঠি পড়িতে এত ভাল লাগে! মণিমালার চিঠিতে বিশেষ কোন কবিত্ব থাকে না, সাদাসিধা আমি-ভাল-আছি-তুমি-কেমন-আছ গোছ চিঠি, তবু পড়িতে ভাল লাগে। বিমল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পাঠ করিতেছে এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া হুড়মুড় করিয়া ষ্টেশনের পয়েণ্টসম্যান চন্দু আসিয়া উপস্থিত। এক পা কাদা, সর্ব্বাঙ্গ ভিজা, দুই হাতে দুইটি সিক্ত ছাতা!

—বড়বাবু আপনাকে ডাকছেন হুজুর, জলদি।

—কেন ?

—খোকা খাট থেকে গিরে গিয়ে বেহোঁস হয়ে গেছে।

—তাই নাকি, বড় বৃষ্টি পড়ছে যাব কি ক'রে ?

—বাবু ছাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন,—চন্দু ছাতাদ খোইল।

এই বৃষ্টিতে বিমলের বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু খোকা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, না গেলেও নয়। যোগেনকে জল গরম করিতে বারণ করিয়া দিয়া অবশেষে বিমল হাঁটুর উপর কাপড়তুলিয়া খালি পায়ে বাহির হইয়া পড়িল। এক জোড়া মাত্র জুতা আছে, সেটাকে ভিজানো ঠিক হইবে না। চন্দু ষ্টেশনের একচক্ষু আলোটি আনিয়াছিল, তাহারই আলোকে কোনক্রমে বিমল মাষ্টারমহাশয়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল।

সেখানে গিয়া কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। কোথায় কি, কেহই ত অজ্ঞান হয় নাই! মাষ্টার-মহাশয়ও বাড়ীতে নাই, তিনি ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে পাঠাইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রটি খাটের উপর হইতে মারামারি করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিল এবং মাষ্টার-মহাশয়ের গৃহিণীর বর্ণনানুযায়ী পড়িয়া যাইবার পর একটু যেন "কেমন কেমন" করিতেছিল। এখন অবশ্য সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তবু যদি ডাক্তারবাবু একবার উহার নাড়ীটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখেন! বিমল গম্ভীরভাবে তাহার নাড়ীটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। তাহার যত দূর মনে পড়িল এই মাসেই সে ঘোষালবাবুর ওখানে অন্ততঃ দশ বার গিয়াছে। সে পরদিন চল্লিশ টাকার একখানি বিল ঘোষালবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল। টাকা অবশ্য ঘোষালবাবু দিলেন না। পরেশ-দার অনুরোধে ইহা লইয়া বিমলও আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। ঘোষালবাবুর মধ্যে দুইটি পরিবর্ত্তন কিন্তু দেখা দিল, প্রথম তিনি বিমলকে পরিত্যাগ করিলেন, দ্বিতীয় তিনি ভূধরবাবুর ডিস্‌পেন্‌সারিতে মাঝে মাঝে যাতায়াত সুরু করিলেন। তাঁহার মেয়ের জ্বর হওয়াতে ভূধরবাবুই এক দিন আসিয়া দেখিয়া গেলেন এবং বিমল লোক পরম্পরায় শুনিল, ঘোষাল না কি বলিয়াছেন যে পয়সা দিয়া ডাকিতে হইলে ভাল ডাক্তারই তিনি ডাকিবেন, বাজে ডাক্তারকে ডাকিতে যাইবেন কেন! ভূধরবাবু অবশ্য একবারই আসিয়াছিলেন। তাহার পর সাবেক জগমোহনই পুনরায় আসিয়া ঘোষালবাড়ীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিলেন। বিমল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

১১

দেখিতে দেখিতে আরও মাসখানেক কাটিল। এক দিন মহাসমারোহে 'বিসর্জ্জন' নাটক অভিনীত হইয়া গেল। প্রত্যেকের ভূমিকাই চমৎকার হইয়াছিল। অপর্ণার ভূমিকায় আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে অদ্ভুত অভিনয় করিল। পুরুষমানুষে মেয়ের ভূমিকা এত সুন্দর করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে বিমল আশাই করিতে পারে নাই। বিমলের নিজের ভূমিকাও চমৎকার হইয়াছিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় এ অঞ্চলে আর না কি হয় নাই। মথুরবাবু অভিনয়-রসিক, বিমলের অভিনয়ে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একটা সোনার পদক তাহাকে উপহার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ও অঞ্চলের গণ্যমান্য ধনী সকলেরই নিকট অমর টিকিট বিক্রয় করিয়াছিল, সকলেই আসিয়াছিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটির পরিচয় লাভ করিয়া সকলেই খুশী হইলেন। মহিলাদের জন্য চিকের আলাদা বন্দোবস্ত ছিল; বিনোদিনী, সেফালি এবং মথুরবাবুর বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা চিকের অন্তরালেই বসিয়া ছিলেন। পর্দ্দা বিষয়ে মথুরবাবু, বিশেষ করিয়া মথুরবাবুর গৃহিণী রীতিমত সনাতনপন্থী। অসূর্য্যম্পশ্যা না হইলেও আলোকম্পশ্যা যে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পালকি ছাড়া কখনও বাড়ীর বাহির হন না। মোটর আছে কিন্তু তাহা খোলা মোটর বলিয়া তাহাতে মেয়েরা চড়ে না। মথুরবাবু একটি ঢাকা মোটর কিনিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মথুরবাবুর স্ত্রীর তাহাতে নাকি ঘোর আপত্তি। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আমাদের পালকিই ভাল। পালকি আছে ব'লে তবু কয়েকটা লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, মোটর হ'লে ও বেয়ারাগুলোকে তোমরা ত আর রাখবে না! তাছাড়া ও মোটর-ফোটরের চেয়ে পালকিই আমার বেশী পছন্দ।" মহিলা-দর্শকগণের মধ্যে

অধিকাংশই পর্দ্দানশীন ছিলেন। বাহিরে চেয়ারে আসিয়া যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিন জন মেমসাহেব ছিলেন, তাঁহারা সদর হইতে মোটরযোগে অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন—পুলিস-সাহেবের স্ত্রী, জজ-সাহেবের স্ত্রী এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী। তাঁহারা অবশ্য বেশীক্ষণ বসেন নাই, খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বাহিরে চেয়ারে একটি বাঙালী মহিলাও বসিয়াছিলেন, তিনি একাই ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। বিমল শুনিল তিনি নাকি সৌরীনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী, কলেজের পাস না হইলেও খুব শিক্ষিতা এবং মার্জ্জিত-রুচি। একটু অতি-আধুনিকতার শুচিবায়ু আছে এবং সেজন্য নাকি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারেন না; যখনই যেখানে যান নিজের একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলেন। এসব সত্ত্বেও নাকি সুপ্রিয়া সরকার মেয়েটি "কোয়াইট্ টলারেবল্"—জয়সিংহ-বেশে সজ্জিত অমর অন্ততঃ সেই কথাই বিমলকে বলিল। সিভিল সার্জন আসেন নাই, কিন্তু তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী নাকি আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা চিকের অন্তরালে বসিয়াছেন বলিয়া মণিমালার বান্ধবী তরঙ্গিণীকে বিমল দেখিতে পাইল না। মথুরবাবুর বাড়ীর কাছেই ক্লাব, সুতরাং তাঁহার সদ্য বসানো 'ডায়নমো'র সহায়তায় রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অভিনয়। এই জন্যই সকলের উৎসাহ আরও বেশী হইয়াছিল;—সুবিধা কত! কিন্তু অসুবিধাটাও খানিকক্ষণ অভিনয় হওয়ার পর বোঝা গেল—হঠাৎ সব আলো একসঙ্গে নিবিয়া গেল। অগত্যা অভিনয় কিছুক্ষণ বন্ধ রহিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মেজাজ ও যোগাযোগ ঠিক হইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। এমন একটা কলরব উঠিল যে, মনে হইল সব বুঝি পণ্ড হইয়া যায়! নানা রকমের

নানা মন্তব্য, নানা গ্রামে নানা রকম শিস চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই যখন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ দপ করিয়া আবার সব আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং অভিনয় পুনরায় সুরু হইল। মাঝখানে খানিকটা গোলমাল হওয়াতে একটু রসভঙ্গ অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু অভিনেতাদের অভিনয়গুণে আবার বেশ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না।

অভিনয়ান্তে অমর বলিল—খরচখরচা বাদে ৩১১॥/১০ বেঁচেছে, এর সবটাই কি তুই চাস?

—নিশ্চয়!

—কেন, তোমার বদিবাবু ত পাঁচ-শ টাকা জোগাড়ই করছে।

—না, আমার অনেক দরকার টাকার, আমার বাসাটার চার দিক দিয়ে জল পড়ছে, সারাতে হবে।

—সব টাকা দিচ্ছি না, আড়াই-শ তুমি নাও, বাকিটা নিয়ে আমরা সবাই স্ফুর্ত্তি করি এক দিন। কি বল'হে, শরৎ—

শরৎ ছোকরাটি অপর্ণা সাজিয়াছিল। চিরন্তন বখাটে ছোকরা ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারে নাই, থিয়েটার করিতে পারে বলিয়া অমরই তাহাকে এখানকার কো-অপরেটিভের একটা চাকরী জুটাইয়া দিয়াছে। সে একটু বিনীত অথচ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হাঁ সার্।

—অত টাকা নিয়ে কি স্ফুর্ত্তিটা করবি শুনি?

অমর হাসিয়া বলিল—অত টাকা আর কই, ও কটা টাকাতে কি-ই বা হবে, মাঝ থেকে আমার পকেট থেকে গচ্ছা লাগবে আর কি! এক কাজ করলে হয়, সতীশখুড়োকেও দলে টানলে মন্দ হয় না, তাঁরই বাগানবাড়ীতে জোটা যেতে পারে।

বিমল এ-সবের নিগূঢ় অর্থ কিছুই বুঝিতেছিল না। সতীশবাবু নামটা কিন্তু তাহার পরিচিত, সতীশবাবুর ভায়ের সে কালাজ্বর চিকিৎসা করিয়াছে, সেই সতীশবাবু না কি! জিজ্ঞাসা করিতেই অমর বলিল—হ্যাঁ সেই।

—তোর খুড়ো হয়?

—হয় বইকি এক সম্পর্কে, আমার বোন শেফালির খুড়শ্বশুর। জ্যোতিষবাবুর ছেলের সঙ্গে শেফালির বিয়ে হয়েছে কি না! ওরা তিন ভাই—জ্যোতিষ, সতীশ, অতীশ। তুই অতীশের চিকিৎসা করেছিলি।

একটু থামিয়া অমর পুনরায় হাসিয়া বলিল—শেফালির বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই কিন্তু সতীশবাবু আমাদের খুড়ো, উনিই ত প্রথমে হাতেখড়ি দেন আমাদের! এক হিসেবে গুরুদেবও।

শরৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসি গোপন করিতে করিতে মুখের পেণ্ট তুলিতেছিল।

অমর গম্ভীরভাবে বলিল—খুব মজলিসি লোক আমাদের সতীশ-খুড়ো, আলাপ ক'রে দেখিস, খুড়োরই বাগানবাড়ীতে গিয়ে জমায়েৎ হওয়া যাবে এক দিন!

এতক্ষণ বিমল লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু এইবার অমর প্রকাশ্য ভাবেই আলমারির পিছন হইতে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বাহির করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিল। বিমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

—ছি, ছি, অমর এ কি!

অমর একটু থিয়েটারি ভঙ্গী করিয়া বলিল—কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু কিছু নয়!

তাহার পর বলিল—তুই এখন বাড়ী যা, 'তিনটে চারটে নাগাদ আমি টাকা নিয়ে তোর ওখানে যাব। তুই যা এখন—

ভোরবেলা নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইতে বিমলের কেবল অমরের কথাই মনে হইতে লাগিল। ছেলেটা সত্য সত্যই একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। অমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি শরীরে, তাহার উপর মদ ধরিয়াছে! বেচারী বিনোদিনী! সেদিন গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে বিনোদিনী ও অমর তাহার বাসায় আসিয়াছিল। বিনোদিনীর জ্যোৎস্নালোকিত মুখচ্ছবিটি বিমলের বার-বার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিনোদিনী কি এখনও অমরকে তেমনই ভালবাসে যাহার প্রেরণায় এক দিন সে তাহাকে লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছিল? অমরের অধঃপতনের কিছু মাত্র ইঙ্গিত কি তাহার অন্তর্যামী মন পায় নাই! সব জিনিষই কি কথায় প্রকাশ করিতে হয়, অকথিত কত জিনিষই ত আমরা এমনিই বুঝিতে পারি। কোথায় যেন সে পড়িয়াছিল ভগবান আমাদের ভাষা দিয়াছিলেন মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য নয়, গোপন করিবার জন্য। উক্তিটা হয়ত অত্যুক্তি, কিন্তু খানিকটা সত্য আছে বইকি উহার মধ্যে। অমর কেমন স্বচ্ছন্দে বিনোদিনীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। সত্যই ভুলাইতে পারিয়াছে কি? বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হয়। পারঘাটে নামিয়া বিনোদিনীর কথাই ভাবিতে ভাবিতে বিমল অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে-ছিল এবং অন্যমনস্ক ভাবেই কখন নিজের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল খেয়াল ছিল না, হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল যখন তাহার মেজশালা শুভেন্দু তাহাকে সম্বোধন করিল।

—জামাইবাবু, আমরা এসে গেছি! দিদি, জামাইবাবু এসেছেন!

বিস্মিত বিমল বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিল হাতলভাঙা সেই

চেয়ারটার উপর মণিমালা স্মিতমুখে বসিয়া আছে। বিমল ঢুকিতেই মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তোমাকে আশ্চর্য্য ক'রে দেব ব'লে কোন খবর না দিয়েই আমরা এলুম—এসে নিজেরাই বেকুব! মা কিন্তু বলেছিলেন নয় রে খোকা যে ডাক্তার মানুষ কলে-টলে কোথাও বেরিয়ে গেলে মুশকিলে পড়বি তোরা! ওকি, তোমার মুখে ও-সব কি!

বিমল হাসিয়া বলিল—পেণ্টগুলো ওঠে নি বোধ হয় ভাল ক'রে!

—কিসের পেণ্ট?

—কাল রাত্রে থিয়েটার করতে গেছলাম ওপারে।

—কি থিয়েটার?

—'বিসর্জ্জন'।

—হঠাৎ থিয়েটার! ওপারে কোথায়?

—অমরদের ওখানে।

মণিমালার মুখে নিমেষের জন্য একটা ছায়াপাত হইল।

—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ থিয়েটার?

বিমল অকারণে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল যেন কি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়া সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া বলিল—আমাদের হাসপাতালে কিছু টাকার দরকার পড়েছিল, তাই থিয়েটার ক'রে সেই টাকাটা তোলা গেল!

—টিকিট ক'রে হয়েছিল বুঝি?

—হাঁ, দাঁড়াও আমি আগে মুখটা পরিষ্কার ক'রে ফেলি।

বিমল তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল।

একটু পরে বিমল বাথরুম হইতে বাহির হইতেই মণিমালা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি কি!

—কি ?

—ওই চেয়ারে তুমি বসতে, ওই চৌকিতে ওই বিছানায় শুতে !

—স্বচ্ছন্দে !

ছি, ছি, তোমরা সব পারো। এই ময়লা গেঞ্জি প'রে রোজ তুমি হাসপাতালে যাও ! চাকরটাকে বলতে পার না একটু সাবান দিয়ে দিতে !

চাকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিমল মিথ্যাভাষণ করিল।

—সাবান তো প্রায়ই দেয়।

—দেয় না আরও কিছু ! ছি ছি ঘরদোর কি ক'রে রেখেছ আজই থামো সব পরিষ্কার করাচ্ছি ! পরিষ্কার করাবই বা কি ক'রে যা বিচ্ছিরি তোমার ঘরের মেঝে, সিমেণ্ট উঠে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে ফাটলে ফাটলে সব যত রাজ্যের ময়লা !

বিমল বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজে যে-সব বিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করে না, সেই সব বিষয় লইয়া এই তরুণীটি ত মহা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তরুণীটি অপর কেহ নহে তাহারই সহধর্ম্মিণী ! বারান্দার এক প্রান্তে স্তূপীকৃত জিনিষগুলির প্রতি সে চাহিয়া দেখিল। অনেক জিনিষ আনিয়াছে ত। একটা বড় তোরঙ্গ, একটা চামড়ার স্যুটকেস, একটা ছোট হাতবাক্স, তাছাড়াও আর একটা অ্যাটাচি-কেশ— প্রত্যেকটিতেই বেশ পরিচ্ছন্ন খাকির ওয়াড় পরানো। হোল্ড-অলে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়া বাঁধা বিছানার ফাঁকে যে বালিশটি উঁকি দিতেছে তাহাও বেশ ঝালর-দেওয়া ওয়াড়-পরানো এবং ঝালরের ওধারেও লাল সুতা দিয়া কি একটা কারুকার্য্য করা আছে যেন ! ইহা ছাড়া প্রকাণ্ড একটা মাটির হাঁড়িতে কি যেন রহিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড পুঁটুলি, কাপড় দিয়া বাঁধা চৌকোণা ও বস্তুটা কি ! ওদিকে একটা কেরোসিন

কাঠের বাক্সের ভিতরই বা কি রহিয়াছে। মণিমালার সঙ্গে যে এত-গুলো জিনিষ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহা ত বিমল একবারও ভাবে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—কুকুরটা কই দেখছি না।

—সেটা মিনু কিছুতেই ছাড়লে না, এমন আবদেরে মেয়ে জন্মে দেখি নি কখনো, এমন কাঁদতে লাগলো—

বিমল মনে মনে মিনুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইল।

—ওরে খোকা, খোকা কোথা গেল—

শুভেন্দু সোজা গঙ্গার ধারে চলিয়া গিয়াছিল। গঙ্গায় সার বাঁধিয়া পাল তুলিয়া নৌকা যাইতেছে, অবাক হইয়া সে তাহাই দেখিতেছিল। কলিকাতায় জন্ম, কলিকাতাতেই মানুষ, এই ফাঁকা গঙ্গার ধারটি তাহার ভারি ভাল লাগিতেছিল। যোগেন তাহাকে ডাকিতে গেল।

বিমল বলিল—একটু চা খেয়ে এইবার হাসপাতালে যাওয়া যাক! ওই হাঁড়িটাতে কি আছে?

—সন্দেশ, ভীমনাগের ওখানকার ভাল সন্দেশ। খাও না।

—ওই চৌকোণা জিনিষটা কি বল দিকি?

—ওটা আয়না।

—কেরোসিন কাঠের বাক্সে ওটা কি?

—ওটা একটা সেলায়ের কল, নতুন কিনে এনেছি। তোমাকে কিন্তু মাসে মাসে ওর ইনষ্টলমেণ্ট দিতে হবে, বেশী নয় পাঁচ টাকা ক'রে—

—বেশ।

হাসপাতালে গিয়া কিন্তু বিমল একটি দুঃসংবাদ পাইল। কাল রাত্রে সে যখন থিয়েটার করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন একটি কলেরা রোগী হাসপাতালে আসিয়াছিল এবং একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই মারা

গিয়াছে। চশমার কাচের উপর দিয়া তাকাইতে তাকাইতে গুপিবাবু ভালমানুষের মত বলিলেন—আমি ভাবলাম বুঝি সাধারণ ভেদবমি. কলেরা ব'লে অতটা ধরতে পারি নি, পারলে জগদীশবাবু কি ভূধরবাবু কাউকে খবর দিতাম!

অযৌক্তিকভাবে বিমল বলিল—আমাকে খবর দিলেই পারতেন।

চশমার কাচের উপর দিয়া গুপিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বলিলেন—তা কি হয়, আপনি একটা 'মেন' পার্টে ছিলেন।

—একটা ছুটো কলেরা ফাজ্ খাইয়ে দিলেও ত পারতেন!

—চাবি যে আপনার কাছে!

বিমল চুপ করিয়া রহিল, সত্যই তাহার বলিবার কিছু নাই।

গুপিবাবুর প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করিবার জন্য সে নিজেই কিছুদিন হইতে আলমারির চাবি নিজের কাছে রাখিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া যন্ত্রচালিতবৎ দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। ঘুমও পাইতেছিল, কাল সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই। বাড়ী ফিরিয়া দেখিল তাহার প্রথম রোগী সেই বুড়িটা—যাহাকে সে ষ্টেশন হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল তাহার জন্য কয়েকটি হাঁসের ডিম লইয়া সসঙ্কোচে বসিয়া আছে। বিমলকে ডিমগুলি দিয়া সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

বিমলের বার-বার কলেরা রোগীটার কথা মনে হইতে লাগিল। আহা, বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে!

বৈকালে অমর আসিল। বিমলের হাতে সে ৩১১৷৷/১০ দিয়া বলিল —তখন ঠাট্টা করছিলাম, এ টাকা কি অন্য কিছুতে খরচ করতে পারি!

তাহার পর হাসিয়া বলিল—বাবা তোর জন্যে আজ একটা সোনার

মেডেল গড়াতে দিলেন ! আর একটা কাজও কিন্তু তিনি করেছেন আজ।

—কি ?

—হাসপাতালে কাল রাত্রে একটা কলেরা রোগী নাকি বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, সে-কথা তিনি রিপোর্ট করেছেন সিভিল সার্জ্জন আর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে !

বিস্মিত বিমল চুপ করিয়া রহিল।

১৩

এই বিপদেও বদিবাবু বিমলকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারই পরামর্শ-অনুযায়ী সে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট জবাবদিহি করিল যে হাসপাতাল-কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে সে থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল এবং ঐ থিয়েটার হাসপাতালেরই সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সখের জন্য নয়। আরও লিখিল যে, তাহার অনুপস্থিতিকালে হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার ছিলেন রোগীকে কিছু ঔষধও দেওয়া হইয়াছিল, একেবারে বিনা চিকিৎসায় মরিয়াছে একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বদিবাবু নন্দী-মহাশয়ের স্বাক্ষরিত অনুমতি-পত্র আনিয়া দিলেন এবং বিমল সেটি তাহার জবাবদিহির সহিত গাঁথিয়া পাঠাইয়া দিল। আরও শোনা গেল স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী নাকি বদিবাবুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ইহা লইয়া ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী খানিকক্ষণ বসিয়া থিয়েটার দেখিয়াছিলেন, অভিনয় তাহার নাকি ভাল লাগিয়াছিল, তা ছাড়া একটা সৎকার্য্যের জন্য যখন হইতেছে মোট কথা ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল, বিমলের কিছুই হইল না।

এই প্রসঙ্গে হরেন বোস সক্ষোভে চৌধুরীকে বলিলেন—এই ডাক্তার ছোকরার কেন্দ্রে বোধ হয় বৃহস্পতি আছে, বুঝলেন!

চৌধুরী বলিলেন—সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে নন্দী-মহাশয় সহাস্য মুখে বিমলকে বলিলেন—কি রকম ডাক্তারবাবু, পরিচয় পেলেন ত কি রকম কেউটেটি!

বিমল স্মিতমুখে বলিল—আশ্চর্য্য লোক, অথচ ওঁর ছেলেরই অনুরোধে আমি রাজি হয়েছিলাম—

—আশ্চর্য্য লোক নয়, পাজি লোক।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—অত্যন্ত হারামজাদা ব্যক্তি!

বিমল কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বদিবাবুর সঙ্গেও এক দিন দেখা হইয়াছিল। তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ওষুধপত্তর ত সব এসে গেল, আর কি, এইবার পাড়ি জমিয়ে ফেলুন! ভূধর আর জগদীশকে চটাবেন না, ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করুন।

—আচ্ছা।

মণিমালা ইতিমধ্যে সংসার গুছাইয়া ফেলিয়াছে। ঠিক মনোমত ভাবে নয়, মোটামুটি। প্রথমেই সে ঐ হাতলভাঙা চেয়ার ও নড়বড়ে চৌকিটাকে সংস্কার করাইয়াছে, সামান্য একটু সারাইয়া বার্নিশ করিয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে। ঘরে ঘরে ঝুল ছিল, দালানে পাখীর বাসা ছিল, উঠানের কোণটা একটা আঁস্তাকুড় হইয়াছিল যেন! চায়ের পাতা, ছেঁড়া কাগজ সিগারেটের খালি বাক্স, কনডেন্স্ড্ মিল্কের খালি টিন, এঁটোকাঁটা কি না ছিল ওখানে। যোগেনকে দিয়া মণিমালা সব পরিষ্কার করাইয়াছে, পরিষ্কার করাইবার সময় কত বড় প্রকাণ্ড একটা বিছা বাহির হইল! অনায়াসে সাপও থাকিতে পারিত।

ওদিককার ঘরটাও কি কম নোংরা হইয়াছিল ! যত রাজ্যের পুরাতন খবরের কাগজ, একটা ছেঁড়া বালিশ, কালিহীন একটা শুকনো দোয়াত, আর যোগেনের একটা ময়লা বিছানা ! ওইটুকু ছোঁড়া বিড়ি খায় কত, বিড়ির টুকরায় সমস্ত ঘরটা যেন পরিপূর্ণ ! যেমন প্রভু, তেমনি ভৃত্য ! ও-ঘরটা পরিষ্কার করিয়া মণিমালা যোগেনের শুইবার ব্যবস্থা বাহিরের ঘরটাতে করিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে বিছানাপত্র যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আর বিড়ি খাইয়া যেন ঘরে না ফেলে। নিজের কলটি, আয়নাটি, বাক্সগুলি বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইবার পর মণিমালা আবিষ্কার করিয়াছে দুইখানি টেবিল, খানচারেক ছোট ছোট 'ডিসেণ্ট' চেয়ার, একটি আলনা, একটি ছোট ঘড়ি না হলে চলিবে না। ওগুলি অবিলম্বে চাই। ছোট ছোট গোটা-দুয়েক তেপায়া, একটি আরাম-কেদারা একটি 'হোয়াট নট' পরে কিনিলেও চলিবে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিষ অবিলম্বে চাই—একটা মিট-সেফ্। এ-সব ত গেল আসবাব-পত্র। ঘরের দেওয়ালগুলি চুনকাম করানোও দরকার, জানলা কপাট-গুলিও রং করাইতে হইবে, মেঝেটা আর একবার সিমেণ্ট করাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। ঘরের তাকগুলাও কি বিশ্রী ! উহারই উপর খবরের কাগজ পাতিয়া মণিমালা আপাতত: চালাইতেছে বটে, কিন্তু গোটাদুই ভাল কাচের আলমারি তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে।

হঠাৎ কলেরা এপিডেমিক সুরু হইয়া গেল।

হাসপাতালে প্রতি দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অন্তর রোগী আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে হাসপাতাল ভরতি হইয়া গেল। শেষে বিমল হাসপাতালের সামনের মাঠটায় খড়ের চালা তুলিয়া রোগী রাখিতে সুরু করিল। থিয়েটারের টাকাটা হাতেই ছিল, টাকার জন্য কাহারও

কাছে হাত পাতিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে চালাগুলিও ভরিয়া গেল, সেখানেও স্থানাভাব। যাহাদের হাসপাতালে স্থান দিতে পারিল না তাহাদের বাড়ী গিয়াই বিমল তাহাদের চিকিৎসা করিতে লাগিল। তাহার স্নানাহারে অবসর নাই—কেবল স্যালাইন, 'ফাজ' আর ভ্যাকসিন! ডুলু এবং গুপিবাবুও খুব খাটিতে লাগিলেন,—ডুলু প্রাণ দিয়া, গুপিবাবু প্রাণের দায়ে। ঘরে ঘরে মাছির মত লোক মরিতেছে! যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—অসহায় দীন-দরিদ্রের দল!

মণিমালা ভয় পাইয়া গেল! তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার স্বামী এ কি করিতেছে! নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখা ত উচিৎ, একাই সকলকে দেখিতে হইবে তাহারই বা মানে কি। রোজগার হইলেও বা না হয় কথা ছিল, অনর্থক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এ সব কি কাণ্ড! একটুও ভাল লাগে না তাহার! বিমলকে বলিলে সে কথা শোনে না। সে দিনরাত পাগলের মত ঘুরিতেছে! সবাই যে বাঁচিল তা নয়, অনেক মরিল, অনেক বাঁচিল। এই কলেরা রোগী লইয়াই বিমলের বদনাম হইয়াছিল, ইহাতেই তাহার আবার সুনামও হইল। হাসপাতালের নূতন ডাক্তার বাবুটির সুখ্যাতিতে দেশ ছাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

ছয় মাসের মধ্যে দেখিতে দেখিতে বিমলের প্র্যাক্‌টিস জমিয়া উঠিল। সব দিক্ দিয়াই সুবিধা হইয়া গেল। হাসপাতালে ঔষধের অভাব নাই, রোগী অনেক আসিতেছে এবং তাহাদের মুখে মুখে বিমল

ডাক্তারের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নন্দী মহাশয় এবং বদিবাবু তো বিমলের পক্ষে আছেনই, হাসপাতাল-কমিটির অন্যান্য সদস্যগণও তাহার উপর প্রসন্ন হইতেছেন। এমন কি হরেন বোস এবং চৌধুরী মহাশয়েরও উগ্রভাবটা যেন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আর কিছু নয়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে "ট্যাক্ট" অর্থাৎ লোক পটাইবার ক্ষমতা তাহা যে বিমলের যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সেবিষয়ে সন্দেহ করিবার আর অবকাশ নাই। কোন রকমে চৌধুরী মহাশয়কে আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে হরেনবাবুও তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িবেন, তাহা বিমল বুঝিয়াছিল। একদিন সুযোগও ঘটিয়া গেল। চৌধুরী মহাশয়ের ছোট নাতিটি পীড়িত হইয়া পড়িল। বছর-দেড়েক বয়স ভায়ানক জ্বর। সাধারণতঃ জগদীশবাবুই চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অসুখ হইলে দেখেন, এবারও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু বিমলের সৌভাগ্যক্রমে শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। জগদীশবাবু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—বিমলবাবুর মাইক্রসকোপ আছে, ওঁকে ডেকে রক্তটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নিন। সুবিধে যখন রয়েছে—

সিভিল সর্জনের সহিত জগদীশবাবুর গোপনে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা অজ্ঞাত, কিন্তু আজকাল জগদীশবাবু প্রায়ই বিমলের মাইক্রসকোপের সাহায্য লইতেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক জগদীশবাবু আর একটা কথাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বোধ হয়। চিকিৎসা-ব্যাপারে দায়িত্বটা যত ভাগাভাগি হইয়া যায় ততই মঙ্গল। তিনি রক্তপরীক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় হরেন বোসের সহিত এ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে করিতে বড় দেরি করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাও বিমলের পক্ষে ভারি সুবিধাজনক হইল। সঙ্গে

সঙ্গে ডাকিলে বিমল হয়ত আসিয়া রক্তই পরীক্ষা করিত এবং কিছুই পাইত না। কিন্তু দেরি করিয়া ডাকার ফলে ডিপথিরিয়ার লক্ষণসমূহ বেশ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, বিমল রক্ত পরীক্ষা না করিয়া গলা পরীক্ষা করিল এবং গলা হইতে একটা 'সোয়াব' লইয়া দেখিতেই ডিপথিরিয়া ধরা পড়িল। গ্রহ যখন প্রসন্ন হন এমনই হয়। সৌভাগ্যক্রমে ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক 'সিরামও' সে সম্প্রতি ডাক্তারখানায় আনাইয়াছিল। এত দামী ঔষধ এ সব হাসপাতালে সাধারণতঃ থাকে না, তবু যদি কখনও দরকার পড়ে এই জন্য বিমল দুইটা টিউব আনাইয়া রাখিয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেগুলি কাজে লাগিয়া গেল। চৌধুরীর নাতি যখন ভাল হইয়া গেল তখন গদগদ চৌধুরী বিমলকে বলিলেন—এ ঋণ আমি কখনও শুধতে পারব না ডাক্তারবাবু, তবু আপনার পারিশ্রমিক কত দিতে হবে, সেটা অনুগ্রহ ক'রে বলুন।

বিমল হাসিয়া বলিল—আপনার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেব কি! কিছু দিতে হবে আপনাকে।

—না, না, এত মেহনৎ করলেন আপনি—

—কিছু না, এটা তো আমার কর্ত্তব্য করেছি মাত্র। সবার কাছেই কি আর পয়সা নেওয়া চলে, আপনারা হলেন ঘরের লোক—

না না, সেটা—

বিমল কিন্তু এক পয়সা লইল না। চৌধুরী-বিজয় সম্পূর্ণ হইল।

জগদীশবাবু সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ভারি পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমি তো বললুম চৌধুরী মশায়, মাইক্রসকোপের সাহায্য নইলে আপনার নাতির ব্যায়রামটি ধরা পড়বে না! কেমন, বলি নি আমি?

তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি কাঁপিতে লাগিল।

বিমল স্মিতমুখে জগদীশবাবুর মুখের পানে চাহিল এবং বলিল—আমি তো মাইক্রসকোপে দেখে তবে ধরলুম, আপনি তো না দেখেই অনেকটা বুঝতে পেরেছিলেন. আপনাদের চোখই আলাদা, আপনাদের মত এক্‌স্‌পীরিয়েন্‌স্‌ হ'তে ঢের দেরি এখন আমাদের—

তাহার পরদিনই জগদীশবাবু বিমলকে আর একটি রক্ত পরীক্ষা করিতে দিলেন এবং বিমলও একটি টাইফয়েড কেসে এক রকম অকারণেই তাঁহাকে "কন্‌সালটেশনে" অর্থাৎ পরামর্শ করিবার অজুহাতে ডাকিল। একেবারে অকারণে নয়, রোগীটি শাঁসালো, একটু ধুমধাম করিয়া চিকিৎসা না করিলে হাতছাড়া হইয়া যাইত। জগদীশবাবু আসিয়া সিভিল সার্জ্জনকে ডাকিবারও ব্যবস্থা করিলেন।

সিভিল সার্জনের সহিতও বিমলের বেশ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। প্রথমতঃ এই উদ্যমশীল যুবক ডাক্তারটিকে প্রথম দিন হইতে তাঁহার বেশ ভাল লাগিয়াছে—এই মৃতপ্রায় হাসপাতালটিকে ছোকরা নিজ চেষ্টায় পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে তো! দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কন্যা তরঙ্গিণীর সখী ইহার স্ত্রী। মণিমালাকে লইয়া বিমল এক দিন তরঙ্গিণীর সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছে। বিমলকে দেখিয়া তরঙ্গিণী, তরঙ্গিণীর মা সকলেই খুব খুশী। সিভিল সার্জনের মনেও কেমন যেন একটা বাৎসল্যভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সুবিধা পাইলেই বিমল তাঁহাকে 'কল' দিতেছে। সেদিনই তো একটা অপারেশনের জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহাকে প্রায় দুই শত টাকা পাওয়াইয়া দিল। সুতরাং অনিবার্য্যভাবে সিভিল সার্জন মহাশয় বিমলকে সুচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

মনিবরা সকলেই যখন সুপ্রসন্ন তখন আর ভাবনা কি! হাসপাতাল-

কমিটির মেম্বারদের বাড়ীতে বিনা-পয়সায় দেখিলেই তাঁহারা খুব খুশী থাকেন। তা ছাড়া বিমল ইঁহাদের নিকট পয়সা লইবেই বা কিরূপে, জগদীশবাবু, ভূধরবাবু কেহই ইহাদের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন না। যদিও ইহারা সকলেই বড়লোক, ফী দিয়া ডাক্তার ডাকিতে সক্ষম, কিন্তু এখানকার রেওয়াজই এমনই দাঁড়াইয়া গিয়াছে! বিমল কেন শুধু শুধু সেই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিতে যাইবে! মোট কথা বিমলের প্র্যাকটিসের পথ মোটেই আর দুর্গম রহিল না। পুষ্পাকীর্ণ না হইলেও কণ্টকাকীর্ণ রহিল না তাহা ঠিক!

পারঘাটার নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বিমল সেদিন বেশ একটু উত্তেজনাভরেই গিয়া ওপারে দামী মোটরটিতে আরোহণ করিল। বাঘমারির জমিদারবাবু সৌরীন্দ্রমোহন বসুর বাড়ী হইতে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। সৌরীনবাবু এ অঞ্চলের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বেশ শিক্ষিত এবং ধনী। সৌরীনবাবুর বাড়ীতে বিমল এই প্রথম যাইতেছে। কি অসুখ এবং কাহার অসুখ কিছুই জানা নাই, সৌরীন-বাবু কেবল একবার যাইতে লিখিয়াছেন। বাঘমারি গ্রামটি প্রায় বারো মাইল দূরে। মোটরে চড়িয়া বসিতেই কেতাদুরস্ত ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল। নিঃশব্দ গতিতে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। বারো মাইল পথ অতিক্রম করিতে অবশ্য বেশী সময় লাগিল না। মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরেই গাড়ী প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা এক অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী-বারান্দার নীচে থামিল। বিমল গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিল দূরে ডিম্বাকৃতি তৃণাস্তৃত 'লনে' একটি ছোট টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি মহিলা এবং দুই জন পুরুষ আরাম-কেদারায় বসিয়া রহিয়াছেন। ড্রাইভার বলিল—আপনি হুজুর ঐখানেই যান, বাবুসাহেব ঐখানেই রয়েছেন।

বিমল অগ্রসর হইল! বিমলকে আসিতে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া একজন ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বিমলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। এ ভদ্রলোকটিকে বিমল ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। খুব ফরসা চেহারা, গালের দুই দিকে বেশ বড় জুলফি, সুলালিত এক জোড়া কালো কুচকুচে গোঁফ, আরক্ত চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত।

—আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু বাবু বসুন।

প্রৌঢ় সৌরীনবাবুকে বিমল চিনিত, তিনিও সেখানে বসিয়াছিলেন। বিমল তাহাকে নমস্কার করিল। তিনি মোটা সিগারটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন—আসুন, ঐ আপনার রোগী—সিগার দিয়াই তিনি উপবিষ্টা একটি মহিলাকে দেখাইয়া দিলেন। সুপ্রিয়া সরকারকে বিমল আগেই চিনিতে পারিয়াছিল।

—কি হয়েছে ওঁর?

সুপ্রিয়া বলিলেন—কিছুই হয় নি। অসুখ আমার নয়—অসুখ এঁদের—

অপর যে মহিলাটি বসিয়াছিলেন তিনি সুপ্রিয়ার জননী ভগবতী দেবী। তিনি বলিলেন—ঐটেই ওর প্রধান অসুখ, ওর ধারণা ওর কিছু হয় নি, অথচ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে!

জুলফিদার যুবকটি বলিলেন—এক মিনিট বসুন ডাক্তারবাবু আমি এখনি আসছি—

তিনি চলিয়া গেলেন। সৌরীনবাবু সিগারে একটা টান দিয়া ঠোঁট দুইটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার কালো দাঁতগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। তিনি সহসা সমস্ত ধোঁয়াটা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—আবার আপনাদের থিয়েটার হচ্ছে কবে, পূজোর সময় হবে না কি?

বিমল হাসিয়া বলিল—কি জানি, আমার সময় হবে না বোধ হয়, আর—

অমরও তো দেশোদ্ধারে মেতেছে,

সকলেই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে মুশকিল !

সুপ্রিয়ার মা কি যেন একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। সৌরীন-বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং চুরুটে মৃদু একটা টান দিয়া সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বউদিদি চটছে, বুঝলি সুপ্রিয়া !

সুপ্রিয়ার মা কিছু না বলিয়া টেবিলের উপর হইতে তাঁহার অসমাপ্ত উলের সোয়েটারটা তুলিয়া লইয়া বুনিতে সুরু করিয়া দিলেন।

সৌরীনবাবু তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির সমর্থন করিয়া পুনরায় বলিলেন—সবাই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে পৃথিবীতে টেঁকা মুশকিল। অকেজো লোকেদের আলসেমির দৌলতেই পৃথিবীটা বাসযোগ্য—এ কথা সবাই ভুলতে বসেছে এই ইউটিলিটির যুগে, আমরা ক্রমাগতই ভুলে যাচ্ছি যে মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার পথে এই ইউটিলিটি-বাদ প্রধান অন্তরায়, এ-কথা তুমি স্বীকার কর না বউদি ?

বউদিদি সোয়েটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন বুঝতেই বুঝতেই পারছিনা তোমার কথা, বাংলা ক'রে বল।

সৌরীনবাবু বলিলেন—ইউটিলিটির বাংলা কি সুপ্রিয়া ?

—উপযোগিতা।

—ও ভারি খটমট হ'ল ; কেজোমি বললে কেমন হয় ? সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—ওটাও শ্রুতিমধুর হল না।

তা হ'ল না বটে, কিন্তু কেজোমির সঙ্গে পেজোমি কথাটার চমৎকার মিল আছে। আর আমার বিশ্বাস আমরা যতই ইউটিলিটির দিকে ঝুঁকছি ততই পাজি হয়ে উঠছি !

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন— তাহ হ'লে তোমার মতে কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক, তোমার মতন ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়ে ব'সে সিগার-ফোঁকাটাই ভাল লোকের লক্ষণ!

সুপ্রিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যাহাকে 'ডেকোরাম্' অর্থাৎ শোভনতা-জ্ঞান বলে, তাহা যদি মায়েব একটু আছে! চটিয়া গেলে তিনি অবলীলাক্রমে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া যাহা মুখে আসে বলিয়া বসেন। আর কাকাবাবুটিও কুটুস্ কুটুস্ করিয়া কথা বলিয়া মাকে চটাইতে পাইলে আর কিছু চান না। মা যেদিন হইতে সোয়েটারে হাত দিয়াছেন, সেই দিন হইতে কাকাবাবু কেজোমির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মন্তব্য করিতেছেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক এ কথা আমি বলছি না, কিন্তু যে-সব মানুষ কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না এবং না-জানাটাকে গৌরবের ব'লে মনে করে, তাদের সম্বন্ধে আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়!

—কি সন্দেহ হয়?

—সন্দেহ হয় যে তারা ছদ্মবেশী মশা, মাছি, ছারপোকা, শকুনি, বাঘ, ভালুক অর্থাৎ নিছক একটা প্রাণী, বেঁচে থাকবার জন্যেই কেবল ছটফট করছে—ঠিক মানুষ নয়!

—অর্থাৎ অকেজো লোকই ঠিক মানুষ তোমার মতে!

সৌরীনবাবু সিগারে একটা টান দিয়া বলিলেন—ঠিক তা নয়, নিছক প্রাণী হিসেবে টিকে থাকবার জন্যে যে বাঁধা পথ আছে সেই পথ ছেড়ে যে যতটা বিপথে যেতে পারে সেই-ততটা মনুষ্যধর্মী। মানুষ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার বিপথে যেতে পারে না। মানুষই গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, থিয়েটার করে। মনের আনন্দে সে

এত কাল এই সব বাজে কাজ ক'রে এসেছে। কিন্তু ইদানীং নিছক এই আনন্দটুকুর জন্যই আর সে এ সব করতে প্রস্তুত নয় দেখা যাচ্ছে। আজকাল আমরা গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতা লিখি, থিয়েটার করি আনন্দের জন্যে নয়—পয়সার জন্যে, সব কিছুকেই কাজে লাগাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। তুমি ঐ যে সোয়েটার বুনছ ওটা নিছক শিল্পচর্চ্চা নয়, তুমি বুনছ আমার শীতনিবারণের জন্যে—

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন—তাতে ক্ষতি কি!

—সব কিছুই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠলে কেমন যেন লাগে। প্রত্যেক কাজের পেছনে একটা মতলব আছে মনে হ'লে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয়। জীবন ধারণ করা মানে একদল মতলববাজ লোকের সঙ্গে ক্রমাগত মোকদ্দমা করা! ব্যাপারটা হয় তো তাই-ই, কিন্তু অবস্থাটা সুখের নয়—

এই বলিয়া তিনি সিগারের ছাইটি ঝাড়িয়া আর একটি টান দিলেন। সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ আগেই তাহার হাতের বইখানি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিলেন, সুপ্রিয়ার মা-ও এ কথার কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। বিমল চুপ করিয়া ভাবিতেছিল অদ্ভুত লোক তো ইহারা! যাঁহার অসুখের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন তাঁহার অসুখই নাই এবং এতক্ষণ ধরিয়া যে-সব কথাবার্ত্তা চলিতেছে তাহার সহিত অসুখের কোন সম্পর্কও নাই। আশ্চর্য্য ব্যাপার! নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলেন—অথচ মজা এই যে আমরা সেই সব মানুষের সঙ্গই পছন্দ করি যারা এই সব বাজে কাজে মজবুত। এই যে বিমলবাবুকে আজ ডাকা হয়েছে এটা তাঁর ডাক্তারি নৈপুণ্যের জন্যে ততটা নয় যতটা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য। সুপ্রিয়া এঁর অভিনয় দেখে খুশী হয়েছিল,

সম্ভবতঃ সেই জন্যেই ইনজেকশন দেবার জন্যে এত লোক থাকতে এঁকেই ডেকে আনা হ'ল।

সুপ্রিয়া বই হইতে মুখ তুলিলেন এবং ভ্রূলতা ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—এত বাজে কথাও বলতে পারেন কাকাবাবু।

সৌরীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—হীরালাল আমার নাম দিয়াছে বৈজিক-সম্রাট্, অবশ্য বাজে কথার জন্যে নয়, আমি ভাল বেজিক খেলতে পারি ব'লে!

জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকটি কতকগুলি কাগজ হস্তে আর একজন ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া হাজির হইলেন. পিছনে দুইজন চাকর চায়েব সরঞ্জাম প্রভৃতিও আনিয়া সাজাইতে লাগিল। জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকের নাম সুধীর এবং তাঁহার সঙ্গে যিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম সুব্রত। সুধীর সুপ্রিয়ার দাদা এবং সুব্রত সুপ্রিয়ার স্বামী। বিমল পরিচয় পাইয়া সুব্রতবাবুকে নমস্কার করিল। মনে মনে বিস্মিত হইল—অতিশয় জীর্ণশীর্ণ ভদ্রলোক তো। চোখের জ্যোতি তীব্র, গালের হাড়-দুইটা উচু হইয়া আছে, নাকটা খড়্গের মত। পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী, পায়ে সুদৃশ্য একজোড়া চটি। তিনি কলিকাতার নামজাদা দুই-তিন জন ডাক্তারের নাম করিয়া বলিলেন—ওঁদের সবাইকে একসঙ্গে ডেকে দেখিয়েছিলাম, ওঁরা দেখে শুনে এই ব্যবস্থা করেছেন। রিপোর্টগুলো দাও তো সুধীর—

বিমল রিপোর্টগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিল, বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। সব রকম পরীক্ষাই হইয়াছে কিন্তু কোনটাতে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। বিমল সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল—এ সব থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, আপনার কষ্টটা কি?

বই হইতে মুখ তুলিয়া সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—বললাম তো, কিছুই না!

সুব্রতবাবু বলিলেন—মাঝে মাঝে যে 'প্যালপিটেশন' হয় সেটা কি তাহ'লে 'মিথ্' ?

সৌরীনবাবু তাঁহার কাঁচাপাকা বাবরিটি এবং ধূম-পক্ক গুম্ফটি গুছাইয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—ইংরেজী 'মিথ' এবং বাংলা মিথ্যার মধ্যে যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, আশা করি সুব্রত তুমি সে অলীক সাদৃশ্যের সুযোগ নিচ্ছ না। যদি নিয়ে থাকো তা হ'লে দুঃখিত হও। তোমরা ব'স, আমি একটু টেনিস-কোর্টটা তদারক করে আসি। হীরালালরা হয়ত এসে পড়বে এখুনি, কালকে নেটটা যা করে টাঙিয়েছিল! আমাদের হরিচরণকে এবার পেন্সন দেওয়া দরকার হয়েছে—

সৌরীনবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

ভগবতী দেবী সোয়েটার হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন —চা-টা খেয়ে যাও।

—একটু ঠাণ্ডা হোক, গরম চা খাবার বয়স গেছে।

একটু দূরে টেনিস-কোর্ট, সেখানে চাকরেরা নেট টাঙাইতেছিল—সৌরীনবাবু সেই দিকে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য টেবিলে চা পরিবেশন করিতে লাগিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—আপনার প্যালপিটেশন হয় বুঝি ?

সুধীরবাবু এতক্ষণ কথা বলেন নাই, তিনি বলিলেন—হজমও হয় না ভাল, ডাক্তার রায় হজমের জন্যে এই সব প্রেসক্রাইব করেছেন।

বিমল বলিল—দেখেছি। বেশ ভাল ওষুধ ওগুলো খাচ্ছেন ?

ভগবতী দেবী বলিলেন—তাহলে আর ভাবনা কি! কি ভাগ্যি যে ইনজেকশন নিতে রাজি হয়েছে।

বিমল বুঝিল তাহার বিশেষ কিছু করিবার নাই। কলিকাতার ডাক্তারের ফরমায়েস অনুযায়ী জার্মানির একটা পেটেণ্ট ঔষধ তাহাকে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ইনজেকশন করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। তাহার ডাক্তারি বুদ্ধির সাহায্যে ইহারা চান না।

বিমল বলিল—চলুন তাহলে ইনজেকশনটা শেষ ক'রে ফেলা যাক—

সুপ্রিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনার ভাল ছুঁচ আছে তো, জগদীশ ডাক্তারের যা ভোঁতা মরচে-পড়া ছুঁচ, সেই ভয়ে তাঁকে আর ডাকি নি।

বিমল হাসিমুখে মিথ্যা কথা বলিল—আপনি জানতেও পারবেন না।

সুব্রতবাবু বোধ হয় সুপ্রিয়ার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। গেট দিয়া আর একটি মোটর প্রবেশ করিল। সুধীরবাবু উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার চা পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিমল ও সুব্রতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার আর কোন দরকার নেই তো?

—না।

—আমি তা হ'লে একটু টেনিস খেলি গিয়ে, হীরালালবাবুরা এলেন।

ভগবতী দেবী বলিলেন—ঠাকুরপোও তা হ'লে আর এল না চা খেতে! বিয়ে না করলে পুরুষমানুষগুলো যেন কি এক রকম হয়ে যায়।

বিমলের দিকে চাহিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন—আপনার বিয়ে হয়েছে তো?

—অনেক দিন।

ইনজেকশন-পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নেই হইয়া গেল।

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বলিলেন—চমৎকার আপনার হাত তো!

বিমল গম্ভীর ভাবে বলিল—হাত নয় কপাল!

একটু থামিয়া আবার বলিল—কি বই পড়েছিলেন ওটা তখন?

—আলডুস হাক্সলির 'ক্রোম ইয়েলো'।

—চমৎকার বই।

—নয়? এঁরাই আমার সঙ্গী, ওই দেখুন না।

বিমল দেখিল আধুনিক, অতি-আধুনিক নানাবিধ পুস্তক-রাজি সুপ্রিয়া সরকারের আলমারির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অধিকাংশই উপন্যাস এবং অধিকাংশেরই নাম পর্য্যন্ত বিমলের জানা নাই।

সুব্রতবাবুর অসন্তোষ ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। তিনি বলিলেন—ক্রমাগত প'ড়ে প'ড়ে চোখটাও নষ্ট করবে তুমি।

সুপ্রিয়া বলিলেন—আচ্ছা তোমরা সবাই আমার স্বাস্থ্যের উপরই বিশেষ ক'রে এত নজর দিয়েছে কেন বল দেখি! দেখুন তো ডাক্তারবাবু, স্বাস্থ্যটা কার বেশী খারাপ, আমার, না ওঁর?

বিমল স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—আপনি কি বরাবরই এই রকম রোগা?

—হ্যাঁ।

—মোটা অবশ্য তুমি কোন কালে ছিলে না কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে তুমি দিন-দিন আরও রোগা হয়ে যাচ্ছ!

—না, না, পাগল! উঠছেন নাকি ডাক্তারবাবু?

বিমল বলিল—হ্যাঁ চলি এবার, নমস্কার!

সুপ্রিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—তিন দিন পরে আবার দেখা হবে, এ ইনজেকশনগুলো না দিলে তো আপনাদের শান্তি নেই!

বিমল হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল। সুব্রতবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সুব্রতবাবু প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা আমার স্ত্রীর অসুখটা কি বলুন তো?

—বিশেষ কিছু নয়, হার্টটা একটু দুর্ব্বল বোধ হয়।

—এ ইনজেকশনগুলো দিলে উপকার হবে?

—ইনজেকশনটার নাম তো খুব বাজারে। আমি এর আগে কখনও ব্যবহার করি নি।

সুব্রতবাবু আর কিছু বলিলেন না।

চলিতে চলিতে টেনিস-কোর্টের কাছাকাছি আসিতে সৌরীনবাবু হীরালালবাবু সহিত বিমলের পরিচয় করাইয়া বলিলেন—ইনিও অদূর ভবিষ্যতে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছেন!

বিমল নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলেন—এমন মধুর রোগী আর পাবেন না আপনি। আজকাল কত পার্সেণ্ট হে?

হীরালাল বাবু হাসিয়া বলিলেন—দশ।

মোটাসোটা গোলগাল হীরালালবাবু চিবুকের নীচে চর্ব্বির বাহুল্য একটা দেখিবার মত জিনিস। দশ পার্সেণ্ট সুগার।

হীরালালবাবু বলিলেন—আসুন এক দিন আমার ওখানে বিমলবাবু।

—আচ্ছা।

বাড়ী ফিরিয়া বিমল দেখিল মণিমালা প্রায় প্রয়োপবেশন করিবার উপক্রম করিয়াছে! এরূপটা যে ঘটিতে পারে বিমলও তাহা প্রত্যাশা

করে নাই ; হারু স্যাকরার তো নামডাক খুব! এখানকার সকলে তো উহাকে দিয়াই গহনা গড়ায়।

ঠোঁট ফুলাইয়া মণিমালা বলিল—তোমার কথায় এখানে গড়াতে দিলাম, একবারে ছাই হয়েছে তাবিজ!

—কই দেখি?

মণিমালা তাবিজ-জোড়া আনিয়া তাচ্ছিল্যভরে বিমলের হাতে দিয়া বলিল—এই দেখ তোমার হারু স্যাকরার কীর্ত্তি!

—কেন, এ তো বেশ হয়েছে।

—বেশ না ছাই! এর নাম কি পালিশ?

—খারাপটা কোন্‌খানে তা তো বুঝতে পারছি না।

সত্যই বিমল বুঝিতে পারিতেছিল না।

—না, খারাপ নয়! ম্যাট্‌ম্যাট্‌ করছে;—তরঙ্গিণী গড়িয়েছে কলকাতা থেকে কেমন চমৎকার।

—এও তো বেশ হয়েছে, দেখি পর তো?

বিমল স্বয়ং পরাইয়া দিতে গিয়া একটু বিপন্ন হইল। কোথায় কি ক্লিপ আঁটিতে হয় তাহা তাহার জানা নাই।

—তুমি ছাড় আমি পরছি।

তাবিজ পড়িয়া হাত দুটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মণিমালা দেখিতে লাগিল।

বিমল বলিল—সুন্দর হয়েছে তো

—ছাই!

তাহার পর তাবিজ খুলিতে খুলিতে মণিমালা বলিল—তোমার কেমন একটা জিদ চড়ে গেল ওই হারু স্যাকরাকে দিয়েই করাবে।

—আচ্ছা, কাল ওকে ডাকিয়ে ব'লে দিচ্ছি আমি, ভাল ক'রে দেবে।

ও বলেছে পছন্দ না হ'লে ফেরত নেবে—

—ডাক্তারবাবু—। বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে।

—কে?

বিমল বাহিরে গিয়া দেখিল ভুলু।

কি খবর?

—হাসপাতালে একটা শূয়োরে-চেরা লোক এসেছে। বুনো শূয়োরে তার পেটটা চিরে দিয়েছে একেবারে।

—চল যাচ্ছি।

বিমল গিয়া দেখিল একটা আঠার-উনিশ বছরের যুবক বন্যবরাহের দন্তঘাতে মৃতপ্রায়। পেটের অন্ত্রগুলো সব বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। এই মফস্বলের হাসপাতালে ইহার সুচিকিৎসা হওয়া অসম্ভব। সদরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মরিবে অপটু হস্তে এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা লইয়াই বিমল যতটা পারিল করিল। অন্ত্রগুলাকে ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া শাস্ত্র-অনুযায়ী যতটা পারিল পরতে পরতে পেটটা সেলাই করিয়া দিল। এমনিই তো মরিত—যদি বাঁচে!

২

গঙ্গাবক্ষে নৌকা সজ্জিতই ছিল, ভূধরবাবু তাহাতে বসিয়া ছিলেন, বিমলও গিয়া আরোহণ করিল। কামারখালির অখিল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে ডাক পড়িয়াছে। অখিল চৌধুরী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত চৌধুরী মহাশয়েরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্রয়োজন হইলে বরাবর ভূধরবাবুকেই ডাকিয়া থাকেন, এবার জ্যেষ্ঠের নির্দ্দেশ অনুসারে বিমলকেও ডাকিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ব্যগ্র।

বিমল নৌকায় আসিয়া উঠিতেই ভূধরবাবু বলিলেন—টিফিন কেরিয়ারে ও-সব কি মশাই ?

—লুচি মাংস।

—আপনি খাদ্য-রসিক আছেন তো মশাই, বাইরে থেকে আপনাকে দেখে নিরামিষ ব'লে বোধ হয় !

বিমল হাসিয়া বলিল—বাইরে থেকে দেখে লোকের সম্বন্ধে বিচার করেন এত কাঁচা লোক তো আপনি নন ! অন্ততঃ আমার তাই ধারণা !

—না, তা বটে, মানে—ভূধরবাবু হাসিয়া নিজের ছোট বেতের বাক্সটি খুলিতে খুলিতে বলিলেন—আমিও আমিষ ব্যাপার এনেছি কিছু, জানি না আপনার এ—সব চলে কি না।

ছোট বোতলটি বাহির করিয়া তিনি বলিলেন—কঁইয়্যাক্ ? অর্থাৎ ইংরেজীতে যার বানান কগ্ন্যাক ! চলে নাকি ?

বিমল বলিল—না।

—তাহলে আর কি আমিষ আপনি ! নিরীহ পাঁটা কেটে সবাই খেতে পারে।

বিমল হাসিল, তাহার পর সহসা কি মনে করিয়া বলিল —বেশ দু-এক ঢোঁক খাওয়াই যাবে না হয়, তাতে আর কি হয়েছে !

ভূধরবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন—সোডায় না কম পড়ে যায়। আনিয়ে নেব নাকি আরও দু-বোতল।

—ক-বোতল আছে ?

—দু-বোতল।

—ওতেই হবে, না হয় শেষে গঙ্গোদক তো আছেই, শোধন হয়ে যাবে !

—যা বলেছেন! আমাদের চক্রবর্ত্তীকে চেনেন? আরে ঐ যে মশাই ওপারের উকিল হারাধন চক্রবর্ত্তী, চেনেন না তাকে?

—নাম শুনেছি, আলাপ নেই তেমন!

—আমি ওর নাম দিয়েছি চৌকোস চক্রবর্ত্তী! একেবারে চৌকস লোক। মদ রোজ খাওয়া চাই' কিন্তু আটঘাট বেঁধে—

—মানে, গ্লাসে প্রথমে ব্রাণ্ডিটি ঢালবেন, তা প্রায় আউন্স-ছয়েক তার পর তাতে গোটা-চারেক কার্টার্স লিভার পিল ফেলে দেবেন, তার পর তাতে চামচ-টাক সোডা তার পর হাতে আংটি-বাঁধা পৈতেটি জড়িয়ে চোখ বুজে গ্লাসের উপর পৈতেসুদ্ধ হাতটি নিয়ে গিয়ে মিনিট দুই মন্ত্রপাঠ করবেন, তার পর আংটিটা মদে একবার ডুবিয়ে চোঁ চোঁ ক'রে মদটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলবেন! রোজ এই ব্যাপার!

—আংটিটা ডোবাবার মানে?

—যে সে আংটি নয়, আংটিতে মীনে-করা কালীমূর্ত্তি রয়েছে, মদ মদ আর মদ রইল না, কারণ হয়ে গেল! চৌকোস রিয়েলি চৌকস!

—চমৎকার লোক তো

—চমৎকার!

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

অগণিত তরঙ্গশীর্ষে মাণিক জ্বলিতেছে। ভূধরবাবু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, বিমলও চাহিয়া আছে। তাহার কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, রগের শিরাগুলা দপ দপ করিতেছে। বিবেকও দংশন করিতেছে। জীবনে এই প্রথম মদ্যপান। কেন সে মদ খাইতে গেল! লোভে পড়িয়া? তাহা তো ঠিক নয়।

মদ দেখিয়া লোভ তাহার কোন কালে হয় নাই। তবে? ভূধরবাবুকে খুশী করিবার জন্য, ভূধরবাবুর লজ্জা নিবারণের জন্যই সে মদ খাইয়াছে। ভূধরবাবু যাহাতে তাহার নিকট অকারণ সঙ্কোচ বোধ না করেন, তাহাকে একটা পীর-পয়গম্বর মনে না করেন, মনে মনে নাক সিঁটকাইয়া যেন না ভাবেন—ইস ভারি আমার সাধু রে! ভূধরবাবুর বন্ধুত্ব কামনায় যদি সে দুই-এক ঢোঁক মদ্যপান করিয়াই থাকে, কি এমন ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে! মন হইতে সে চিন্তাটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা তাহার অমরের কথাটা মনে পড়িল। তাহাকে দেখিয়া সেদিন সে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিল কেন। সে হয়ত এমনি কোন বন্ধুত্বের দাবি মিটাইতে গিয়া—

ভূধরবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—হ্যাঁ, যে-কথাটা বলছিলাম, বিজনেস ইজ বিজনেস! পৃথিবীর চার দিকে টাকা ছড়ানো রয়েছে, কোন ফন্দী-ফিকিরে সে-গুলোকে কুড়িয়ে ঘরে তোলার নামই ব্যবসা! কোন ফন্দী-ফিকির করব না অথচ টাকাগুলো আপনা আপনি এসে আপনার ট্যাঁকে ঢুকে পড়বে তা কি কখনও হয়। এই যে দেখুন না, আমি ঐ যে আখ মাড়িয়ে গুড় তৈরী করবার কলটা বসিয়েছি, ওর তদ্বির করতে হচ্ছে কত রকম! যেখানে যা ঘুষঘাস সিন্নি-পৈরবি সবই দিতে হচ্ছে, না দিলে আমার গুড় নেবে না কেউ! দেখুন আমার মাথায় আর একটা প্ল্যান এসেছে—

—কি?

—আচ্ছা এই গুড়কেই একটু পরিষ্কার ক'রে বোতলে পুরে ভিটামিন-ফিটামিন পাঁচ রকম ভাঁওতা জুড়ে বাজারে বের করলে কি রকম হয়! বিজ্ঞাপন দিলে ঠিক চলে!

বিমল হাসিয়া ফেলিল—আপনার মাথায় খেলেও তো নানা রকম।

ভূধরবাবুও হাসিতে লাগিলেন—না খেললে উপায় কি, যা ভীষণ সময় পড়েছে মশাই, আজকাল রোজগারের নতুন নতুন পন্থা বার করতে না পারলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। যে যাই বলুক মশাই, পয়সাই হ'ল আসল ; ঐ যে আপনাদের চেয়ারম্যান রাখাল নন্দী, কি আর ওর এমন গুণ আছে বলুন, না আছে বিদ্যে না আছে বংশ-মর্য্যাদা, তবু আমরা লেখাপড়া-জানা ভদ্রসন্তানরা ওর দুয়ারে দু-বেলা সেলাম ঠুকছি তো! কেন? ও তাকমাফিক পাটের ব্যবসা ক'রে লাখ কয়েক টাকা রোজগার করেছে এই তার একমাত্র কারণ। তাই ও মান্য, তাই ও গণ্য, তাই ও চেয়ারম্যান, তাই ও সব!

ভূধরবাবু তাকিয়াটার উপর কনুই দিয়া একটু আরাম করিয়া বসিলেন ও গঙ্গার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন—ইটের ভাটাও করব ভাবছি একটা, করতে পারলে খুব লাভ হয় ওতে, এ অঞ্চলে এক ঐ আঢ্যিদের ছাড়া আর কারও নেই।

বিমল বলিল—একা মানুষ আপনি ক-দিক সামলাবেন?

—সামলাতে হবে! শুধু ডাক্তারি ক'রে আর পেট ভরবে না মশাই, সেদিন গেছে! আজকাল কমপিটিশন কত, চার দিকে ডাক্তার তো গিজগিজ করছেই, তার ওপর কবরেজ আছে, হোমিওপ্যাথ আছে, হকিম আছে, হাতুড়ে আছে, মাদুলি আছে, জলপড়া আছে। ঐ যে আমাদের জগদীশবাবু, এদ্দিনের সিনিয়ার লোক, কত রোজগার করেন উনি বলুন তো?

ভূধরবাবু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ভাবটা, দেখি আপনার আন্দাজের দৌড়টা!

বিমল বলিল—কত, পাঁচ-সাত-শ?

—তিনি-শ'র এক ছিদাম বেশী নয়! হবে কোথা থেকে মশাই,

ডাক্তারদের রোজগার বাইরে থেকে খুব বেশী মনে হয়, কারও বাড়ীর সামনে দিয়ে বার-দুই যাতায়াত করলেই সে মনে করে উঃ খুব কামাচ্ছে, কিন্তু যে কামাচ্ছে সেই জানে পকেটে ক'টা টাকা ঢুকল—তাও আবার সবগুলো সচল থাকে না।

—অ্যাঁ কি বলেন।

ভূধরবাবু হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে বিমলের পানে চাহিলেন। তাহার পর আবার সুরু করিলেন—এই কম্পিটিশনের জন্যেই তো মশাই আমি হোমিওপ্যাথি, কবরেজি সব করি, যখন যা সুবিধে। রুগী হাতছাড়া করি কেন! যখন দেখি আমাদের ওষুধে বিশেষ বাগ মানছে না, রুগীর বাড়ীর লোকেরাও একটু দোনা-মোনা করছে, তখন তাক বুঝে তাদের মনোমত ব্যবস্থা ক'রে ফেলি। হোমিওপ্যাথি চাও, চলে এস আমিই দিয়ে দিচ্ছি—এক ফোঁটা কবরেজি চাও, তা-ও দিচ্ছি—অপরের কাছে যাবার দরকার কি! হোমিওপ্যাথির একটা মস্ত সুবিধে খেতে খারাপ নয়, সস্তা, রুগীর ইষ্ট না হোক অনিষ্ট হয় না, আর যখন লেগে যায় অদ্ভুত ফল! অদ্ভুত ফল মশাই, একটা নশিয়া সেদিন কিছুতে কমে না, কমলো শেষে ইপিকাক থার্টিতে!

বিমল বলিল—কবরেজিটা কিন্তু একটু—

তাহার কথা সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া ভূধরবাবু বলিলেন—ঐ কয়েকটা ওদের বাঁধি গৎ আছে, মকরধ্বজ, স্বর্ণপর্পটি, চ্যবনপ্রাশ, ঐ আমাদেরই মত ব্যাপার! আর্সেনিক, আয়রন্, ক্যালসিয়াম আর তার সঙ্গে বায়ুপিত্তকফঘটিত কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোক! কবরেজরাই কি জোচ্চুরি করে না মনে করেন! অধিকাংশ কবরেজই আজকাল কুইনিন ব্যবহার করে, অ্যালকহল ব্যবহার করে। পয়সা রোজগার করতে হ'লে

এ-সব না ক'রে উপায় কি ! সেদিন তো দেখলাম এক কবরেজ এমিটিন ইনজেকশন দিচ্ছে—

—তাই না কি ?

—না তো কি ! নিও-সালভারশনের মতন ওষুধ যে কোন হাতুড়ে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিচ্ছে ! এই কবরেজগুলো আমাদের পরম শত্রু, ক্রমাগত আমাদের বিরুদ্ধ প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ক'রে বেড়ায়। আমিও বাগে পেলে ছাড়ি না। এই সেদিন আমি সঞ্জয় কবরেজকে বেশ নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিয়েছি ! ওর কম্পাউণ্ডার এসে আমারই দোকান থেকে কুইনাইন কিনছিল, এক-দোকান লোকের সামনে দিলুম এক্সপোজ ক'রে বাছাধনকে !

বিমল মাঝিকে প্রশ্ন করিল—আর কত দূর মাঝি ?

—ঐ যে আলোটা হুজুর, ঐ যে দূরে একটুকুন টিপকাছে—

ভূধরবাবু বলিলেন—এখনও মাইল-দুই তার মানে এটুকু আর বাকি থাকে কেন, শেষ ক'রে ফেলি আসুন।

—আপনি খান, আমি আর খাব না।

—আরে খান খান, ঐ তাগড়া শরীর আপনার, কিছু হবে না।

—না থাক, প্রথম দিনেই অত ভাল নয়।

ভূধরবাবু অগত্যা বাকিটুকু একাই ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিলেন। মুখটি মুছিয়া বলিলেন—এই যেখানে আমরা যাচ্ছি, কামারখালিতে, দেখবেন এক জন ডাক্তার আছেন, পাকা ব্যবসাদার যাকে বলে ! এম. বি. নন, সাব-এসিস্টেণ্ট সার্জন, কিন্তু পাকা লোক। জমি-জারাৎ খেত-খামার বিস্তর করেছেন, প্র্যাকটিসও খুব ! কিন্তু ডাক্তারি ব্যবসা কি ক'রে করতে হয় জানেন ভদ্রলোক।

—কি রকম ?

—এই ধরুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁর ডিসপেনসারিতে প্রকাণ্ড একটা কড়া ক'রে রোজ বার্লি তৈরি হয়, আর গরীব রুগীদের সেটা তিনি বিতরণ করেন। খরচ বিশেষ কিছুই নয়, দু-আনার বার্লিতে ভেসে যাবে কামারথালি, কিন্তু এর জৌলুষটা ভীষণ, সবাই ধন্য ধন্য করছে। ডাক্তারের এত দয়া যে নিজের ওখান থেকে বার্লি পর্য্যন্ত তৈরি ক'রে গরীবদের দেয়। মহাদেববাবুর আর একটি ভয়ানক অস্ত্র আছে—সহজে কথা বলেন না। আপনি আপনার বিদ্যে ফলিয়ে যতই ব'কে মরুন মহাদেববাবু চুপচাপ, বড়জোর চোখ দুটো হয়ত ওপর দিকে তুললেন, কিংবা একটু ভুরু কোঁচকালেন, কিংবা হয়ত একটু মুচকি হাসলেন—ব্যস! আপনার সামনে সাধ্যপক্ষে কিছু বলবেন না, যা বলবার আপনি চ'লে গেলে বলবেন! এবং যেটি বলবেন সেটি কামারহাটির সকলের কাছে বেদবাক্য। বিশেষত মেয়েমহলে। একবার এই গ্রামের একটি মেয়ের জ্বর হয়েছিল, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাই শুনে একেবারে এক সায়েব সিবিল সার্জন নিয়ে এসে হাজির। মহাদেববাবু কিছু বললেন না। সায়েব দেখে শুনে সেই সনাতন কুইনাইন মিকশ্চার লিখে দিয়ে গেলেন, কুইনিন আর অ্যাসিড এন. এম. ডিল.। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াতে মহাদেববাবু চটেছিলেন। তিনি মেয়ের মাকে ডেকে বললেন—দেখ বাছা, তোমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি থেকে সায়েব-ডাক্তার এসে দেখে গেল, খুবই আনন্দের কথা এটা। কিন্তু সায়েব যা ওষুধ দিয়ে গেলেন তা সায়েবি ধাতে সইতে পারে কিন্তু তোমার ঐটুকু মেয়ে তা সইতে পারবে কি না সন্দেহ—এই দেখ—ব'লে তিনি ফোঁটা দু-চার অ্যাসিড শানের উপর ফেললেন। বুঝতেই পারছেন সঙ্গে সঙ্গে বজবজ ক'রে উঠল, শানের খানিকটা ক্ষয়েও গেল। মহাদেব চিন্তিত মুখে সেই দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে

বললেন—যে ওষুধে শান গ'লে যাচ্ছে, সে ওষুধ ওই কচি মেয়েকে দিতে বাপু আমার কেমন যেন—। আর বলতে হ'ল না সায়েবের ওষুধ চলল না। তার পর দিন আমি এলুম, মিকশ্চার দিলুম না, দিলুম কুইনিন পাউডার।

একটু থামিয়া পুনরায় ভূধরবাবু বলিলেন—লোকটার রুগী দেখার ধরণও অদ্ভুত। আপনি যা দেখবার দেখলেন—বুক, পেট, জিব, চোখ, আপনার দেখা হয়ে গেলে মহাদেব হয়ত খুব নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে মাথার চুলগুলো দেখতে লাগলেন। আপনি যদি জিগ্যেস কবেন কি দেখছেন, কোন উত্তর দেবেন না, একটু মুচকি হাসবেন! অদ্ভুত লোক!

বিমল বলিল—আপনার উপর খুব বিশ্বাস বুঝি।

ভূধর হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাসের কারণ আছে, শতকরা পঁচিশ টাকা হিসেবে কমিশন দি।

—বলেন কি?

—একবর্ণ অতিরঞ্জিত নয়।

বিমল নির্ব্বাক্ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল জ্যোৎস্নালোকে নদীর প্রতি তরঙ্গটি যেন মুচকি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিতেছে।

অখিল চৌধুরীর বাড়ির রোগীটির জিহ্বায় ক্যানসার হইয়াছে। ক্যানসার দুরারোগ্য ব্যাধি, বিমল সে কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভূধরবাবুর মুখের পানে চাহিয়া কিছু বলিল না। ভূধরবাবুর চোখের পাতায় সে যেন একটা নিষেধের ইঙ্গিত পাইল। মহাদেব বাবুও তাঁহার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী নীরব রহিলেন। অখিল চৌধুরী মহাশয় বিমলকেই পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কেমন বুঝছেন, ডাক্তার বাবু?

বিমল একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল—কঠিন ব্যাপার।

ভূধরবাবু সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন—তা তো বটেই। কিন্তু কঠিন ব'লে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। চেষ্টা করতে হবে যথাসাধ্য!

মহাদেববাবু একটু মুচকি হাসিলেন।

ভূধরবাবু কাগজে কলমে নানা রকম ভাবে যথাসাধ্য করিলেন। ব্যথার জন্য, ঘুমের জন্য, ঘায়ের জন্য, রক্তপড়া বন্ধ হওয়ার জন্য এবং জীবনীশক্তি বাড়াইবার জন্য নানাবিধ ঔষধের ফর্দ লিখিয়া যখন উভয়ে উঠিতে যাইবেন তখন মহাদেববাবু বলিলেন—এঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া কি উচিত মনে করেন?

ভূধববাবু বলিলেন—পারলে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু এখন যে রকম দুর্ব্বল রয়েছেন, আর যাওয়াও তো সোজা নয়—

অখিলবাবু বলিলেন—দেখুন আপনারা যা ভাল মনে করেন—

ভূধরবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—দিন-পনর দেখুন, যদি একটু উন্নতি হয়, গায়ে একটু জোর-টোর যদি পান, ব্লাডপ্রেসারটা যদি একটু কমে—তখন দেখা যাবে।

মহাদেববাবু নির্ব্বিকার ভাবে গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

নৌকায় ফিরিয়া গিয়া ভূধরবাবু বিমলকে বলিলেন—আপনি আর একটু হ'লে সব মাটি করেছিলেন তো মশাই। ক্যানসার যে ওর সারবে না সে কথা ব'লে আমাদের লাভ কি! ওরা তো চিকিৎসা করাতে ছাড়বে না। আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর এক জন এসে হাল ধরবে। ওরকম কথা কখনো বলতে আছে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ও যতক্ষণ খরচ করতে পারে করুক, আমরা যতক্ষণ নিতে পারি নিয়ে নি।

নৌকা ছাড়িয়া দিলে ভূধরবাবু বলিলেন—মহাদেব বাবুকে ও-কটা টাকা দিয়ে ভালই করলেন, ভবিষ্যতে ফের ডাকবে দেখবেন।

বিমলের কিন্তু কেমন যেন লাগিতেছিল সে একটু হাসিল মাত্র।

৩

পাশে মণিমালা শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, বিমল জাগিয়া আছে। এপাশ-ওপাশ করিয়া কিছুতেই ঘুম আসিতেছে না। অনেক দিন আকাশের নীচে শোওয়া অভ্যাস নাই, তাই বোধ হয়। বহুকাল পরে আজ ছাতে শুইয়াছে। মণিমালা তো ছাতে শুইতে কিছুতেই রাজি ছিল না, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই শেষে আসিয়াছে। ঘরে তাহার একা শুইতে ভয় করে। বিমল নিদ্রিত মণিমালার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা এখানে যেন কেমন ঠিক খাপ খাইতেছে না! তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচির সহিত এখানকার কোন কিছুরই যেন ঠিক মিল নাই। এই বাড়িটা লইয়া তাহার অসন্তোষের সীমা নাই। মেজেটা খারাপ, জানালা-কপাটগুলো খেলো, দেওয়ালের এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে চটা উঠিয়া গিয়াছে, ছাতটা শ্যাওলাপড়া, ছাত হইতে জল পড়িবার নলগুলো বিশ্রী, বাড়ির পিছন দিকটা কেমন যেন জঙ্গলের মত কচুগাছ-ঘেঁটুগাছে ভরা, উঠানটা বাঁধানো নয়, এক পশলা বৃষ্টি হইলে কাদা হইয়া যায়, উঠানের ওদিকের দেওয়ালটা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো ইট বাহির হইয়া আছে, বাড়ির উত্তর দিকে অশ্বত্থ গাছটায় যত কাক ও বকের আড্ডা। বাড়িটা মোটে ভাল নয়! ইহার উপর শহরের একটেরে হাওয়াতে সন্ধ্যার পর কেমন যেন নির্জ্জন হইয়া পড়ে, এমন কি ঐ দিকের মাঠটা হইতে শেয়ালের ডাক পর্য্যন্ত শোনা যায়,

দুই-একটা শেয়াল সে স্বচক্ষে দেখিয়াছেও এক দিন। তাহার উপর সঙ্গী নাই। পাড়ায় যে মেয়ে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। লেখাপড়া করিয়া এ যেন অন্য জাতের হইয়া গিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া বিমলের সঙ্গেও যে মতের খুব মিল হয় তাহাও নয়। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া প্রায়ই তো ঝগড়া হইতেছে। আজই তো দুপুরে সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া রাগারাগি হইয়া গেল। ক্লান্ত বিমল দুপুর বেলায় বিশ্রামের জন্য একটু শুইয়াছে, মণিমালা কল লইয়া বসিল। ব্লাউস না বালিসের ওয়াড় ভগবান্ জানেন কি হইতেছে, কিন্তু শব্দের চোটে অস্থির। বাড়িটা দর্জির দোকান হইয়া উঠিয়াছে। এই আপদটার জন্য মাসে মাসে টাকা গুনিতে হইতেছে। বিমল বলিল—ও খচখচানি বন্ধ কর এখন।

এই কল-প্রসঙ্গে আরও দুই-এক বার বচসা হইয়া গিয়াছিল, মণিমালা দুম্ করিয়া কলের ঢাকাটা কলের উপর চাপাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ারটার উপর বসিল এবং সমস্ত বিকালটা মুখ ভার করিয়াই রহিল। সন্ধ্যাবেলাতেও বিমলের সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই।......ম্লান জ্যোৎস্নালোকে মণিমালার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিমলের সমস্ত বুকখানা অপূর্ব্ব মমতায় ভরিয়া উঠিল। বেচারীর দোষ কি! যেমন ভাবে বাল্যকাল হইতে মানুষ হইয়াছে, ঠিক তেমনটি তো এখানে পাইতেছে না। প্রতাপবাবুর কোন্দলপরায়ণা নাতিনী অথবা পরেশ-দার স্ত্রীর সহিত ইহার কি করিয়া মিল হইবে। প্রতাপবাবুর নাতিনীটি কেবল কলহের ছুতা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং পরেশ-দার স্ত্রীর অতি-ঔৎসুক্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়। মণিমালার কত গহনা আছে, কোনটা কত ভরির, জড়োয়া গহনাগুলার দাম কত, ঝুমকোর বানি কত লাগিয়াছে, ঐ বেনারসীখানা কবে

কিনিয়াছে, ঐ ঢাকাই শাড়িখানা ডাক্তারবাবু নূতন কিনিয়া দিয়াছেন বুঝি, সকালে কি রান্না হইয়াছিল, রাত্রে কি রান্না হইবে, ডাক্তারবাবু কি খাইতে ভালবাসেন পরেশ-দার স্ত্রীর ঐৎসুক্যের সীমা নাই। লেখা-পড়া শিখিয়াছে বলিয়া মণিমালার যে এ-সব ঔৎসুক্য একেবারে নাই তাহা নয়, সেও পরেশ-দার স্ত্রীর নিকট হইতে অনুরূপ অনেক খবর সংগ্রহ করে কিন্তু এ-সব ছাড়াও সে আরও কিছু চায়। সে চায় শরৎ-বাবুর লেখা লইয়া একটু আলোচনা করিতে, রবীন্দ্রনাথের দুই-একখানা গান গাহিতে, সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যে সব গল্প বাহির হইয়া থাকে তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে, ছিমছাম হইয়া বেড়াইতে। কেবল রান্না আর খাওয়া, রান্না আর খাওয়া—এ ছাড়া আর তো কোন কাজ নাই এখানে! বিমল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার সহিত দুই দণ্ড বসিয়া যে গল্প করিবে তাহারও অবসর নাই। দুপুরে অথবা সন্ধ্যার পর যদি কোন দিন অবসর হয় তাহাও যে সে ঠিক কি ভাবে কাটাইবে তাহা বিমল বুঝিতে পারে না। মণিমালার সহিত বসিয়া কি বিষয়ে গল্প করিবে সে। দুই-এক দিন সে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, ঠিক যেন জমে না। এখানে সিনেমা-টিনেমা কিছুই নাই যে মাঝে মাঝে যাওয়া যায়। কলিকাতার শহুরে আবহাওয়ায় মানুষ মণিমালার যেন নির্ব্বাসন হইয়াছে। এখানে বিমলই তাহার একমাত্র আকর্ষণ। কিন্তু বিমলকে সে কতটুকু পায় এবং যখন পায় তখন নাগাল পায় না। বিমল যে-জগতে বাস করে সে-জগতে মণিমালার প্রবেশাধিকার নাই।

হঠাৎ গভীর রাত্রে বিমলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মণিমালা তাহাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আবেগে নয়, ভয়ে।

—ওগো শুনছ, নীচে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে !

বিমল কান পাতিয়া শুনিল একটা শব্দ হইতেছে বটে। বলিল—দেখে আসি দাঁড়াও।

—আমি একা থাকতে পারব না এখানে।

—বেশ চল সঙ্গে।

ছাতের এক কোণে লণ্ঠনটা কমানো ছিল, তাহার শিখাটা বাড়াইয়া লইয়া উভয়ে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। নামিয়া আসিয়া প্রথমে কিছুই নজরে পড়িল না। তাহার পর সহসা দেখিতে পাইল মাঝের ঘরের তালাটা ভাঙা, কপাট খোলা। চোরটা বাক্স ভাঙিতে এত ব্যস্ত ছিল যে ইহাদের পদশব্দ এতক্ষণ তাহার কানেই যায় নাই। ইহারা কাছাকাছি আসিতে তবে সে সচকিত হইয়া উঠিল এবং ছুটিয়া বাহির হইতে গেল। পলাইতে পারিল না, নিমেষের মধ্যে বিমল তাহাকে ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ফেলিল ডাকাডাকি করিয়া যোগেনকে তুলিল। যোগেন তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা কাছে আনিতেই দেখা গেল চোর আর কেহ নয় হাঁসপাতালের পুরাতন চাকর ভৈরব। ইহাকেই কিছু দিন আগে বিমল দূর করিয়া দিয়াছিল। ভৈরবেরই কাপড় দিয়া যখন তাহার হাত-পা বাঁধিতে বিমল ব্যস্ত, তখন সহসা যোগেন বলিল—বাবু, মা মূর্চ্ছা গেছেন !

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল সত্যই মণিমালা মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়াছে।

—তুই ভাল ক'রে বাঁধ একে, পারবি তো ?

—খুব পারব।

যোগেনের হাতে ভৈরবকে ছাড়িয়া দিয়া বিমল মণিমালার কাছে আসিল। সত্যই সে মূর্চ্ছা গিয়াছে, ঠোঁট দুইটা নীল হইয়া গিয়াছে,

হাত-পা ঠাণ্ডা হিম। মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙিল, বিমল তাহাকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মণিমালা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—এখানে থাকলে ঠিক মরে যাব আমি কিছুতে বাঁচব না!

বিমল স্নেহভরে তাহার সিক্ত অলকগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল—ছি অমন করতে নেই। ভয় কি!

কিন্তু সে লক্ষ্য করিল মণিমালা তখনও একটু একটু কাঁপিতেছে।

ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক উঠিয়া পড়িল এবং ভৈরবকে টানিতে টানিতে থানায় লইয়া চলিয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাহাকে যে মারটা মারিল তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর কেমন যেন একটা হিংস্র নিষ্ঠুরতা আছে, সুযোগ পাইলেই কারণে-অকারণে তাহা প্রকট হইয়া উঠে। সকলে থানায় চলিয়া গেলে বিমল সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া শুইতে যাইতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে শঙ্কিত মৃদু কণ্ঠে কে যেন ডাকিল ডাক্তারবাবু!

—কে?

বিমল কপাট খুলিয়া দেখিল শতছিন্ন ময়লাকাপড়পরা একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, তৈলবিহীন এক মাথা রুক্ষ চুল, অনাহার-ক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারা। বিমলকে দেখিয়াই সে বিমলের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল—আর কক্ষনো করবে না বাবু, ওকে ছেড়ে দিন এবারটি—

—কে তুমি?

মেয়েটি উত্তর দিল না।

যোগেন বলিল—ভৈরবের স্ত্রী।

বিমল তাড়াতাড়ি পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা কাল দারোগাবাবুকে বলব আমি।

মেয়েটি চোখ মুছিতে মুছিতে অন্ধকারে একা চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া বিমল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা তাহার মনে হইল স্ত্রী-হিসাবে ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পড়া অশিক্ষিত কুৎসিত মেয়েটি মণিমালার অপেক্ষা বেশী মহিমময়ী। এই অন্ধকারে রাত্রে সে একা তাহার চোর স্বামীর উদ্ধারের জন্য স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়াছে। অন্ধকার বলিয়া ভয় করে নাই, ছেঁড়া কাপড় বলিয়া লজ্জা করে নাই, স্বামী চোর বলিয়া ঘৃণা করে নাই, পায়ে ধরিতে সঙ্কোচ করে নাই। স্বামীই উহার সব, তাহার উদ্ধারের জন্য ও সব করিতে প্রস্তুত। ঘরে ফিরিয়া দেখিল মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আলো লইয়া নিজের বাক্সগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

ভাগ্যে আমরা এসে পড়েছিলুম, গয়নার বাক্সটা তো ঠিক ওপরেই ছিল। ওকি তুমি জামা গায়ে দিচ্ছ কেন?

—বেরব একটু।

—কোথায়?

—হাঁসপাতালে একটা রুগী এসেছে। এক্ষুনি আসছি—

—না, আমার ভারি ভয় করবে তুমি যেওনা।

—ভয় কি, যোগেন তো রইল, টর্চটা দাও তো।

—কি বিচ্ছিরি চাকরি বাপু ভাল লাগে না আমার!

—এখুনি আসছি আমি—

বিমল বাহির হইয়া সোজা থানায় চলিয়া গেল।

থানার দারোগা বিমলের প্রস্তাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন—ছেড়ে দেবো বলেন কি!

—আমার বিশেষ অনুরোধ!

ভৈরবের স্ত্রী বারান্দার এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া আবার বলিল—ওর ঢের শাস্তি হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন এবার।

দারোগাবাবু আড়চোখে একবার ভৈরবের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আপনার কথা ঠেলা তো মুশ্‌কিল, আচ্ছা দেখি—

বিমল হাসপাতালের ডাক্তার, দারোগাবাবুর বাড়ি বিনা পয়সায় দেখে, সুতরাং বিমলের কথা তিনি ঠেলিতে পারিলেন না। ভৈরব ছাড়া পাইয়া গেল।

পরদিন সকালে একটা সুসংবাদও পাওয়া গেল, মণি পাস করিয়াছে।

৪

শ্রীযুক্ত হীরালাল মৌলিক তাঁহার দশ পার্সেণ্ট সুগার সত্ত্বেও আহার কমাইতে প্রস্তুত নহেন। বিনা চিনিতে চা খাওয়া যায় না কি! দুই বেলা অনাহারের পর মধুরেণ সমাপয়েৎ করাটাও তাঁহার চিরকালের অভ্যাস, রাবড়ি-সন্দেশ রোজ তাঁহার চাই-ই। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিতে হইলে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ অনিবার্য্য এবং নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া নিক্তির ওজনে চলাও অসম্ভব। এবম্প্রকার নানাবিধ মুশ্‌কিলের কথা বিবৃত করিয়া হীরালালবাবু

আসল কথাটি পরিশেষে বলিলেন—আসল কথা জানেন কি ডাক্তারবাবু, ভয়ানক লোভী লোক আমি, কিছুতেই লোভ সামলাতে পারি না। বাঙালীর ছেলে ভাত না খেয়ে থাকতে পারি না, আলুটা আমার অতি প্রিয় খাদ্য, মিষ্টির তো কথাই নেই! আর সব রকম খাওয়া যদি আপনারা বন্ধই ক'রে দেবেন তাহলে বেঁচেই বা লাভ কি বলুন পৃথিবীতে, মরে গেলেই হয়!

হীরালালবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিলে তাঁহার খুত্ খুত্ খুত্ খুত্ করিয়া একটা শব্দ হয়, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া যায়, চিবুকের তলায় চর্ব্বি আন্দোলিত হইতে থাকে।

বিমল বুঝিল হীরালালবাবুকে আহার-সংযমের উপদেশ দেওয়ার মানে অরণ্যে রোদন করা। 'ইন্সুলিন্' ইনজেকশনের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। তাহাই করিল। হীরালালবাবু বলিলেন—রোজ নিতে হবে?

—রোজ।

—লাগবে না কি?

সকলেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করে, সকলকেই বলিতে হয় 'কিছু না', সকলেই সে কথা অবিশ্বাস করে, তবু সকলেই ইনজেকশন লয়।

হীরালালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনজেকশন নিলে তো আর খাওয়ার বাধা থাকবে না?

—না বরঞ্চ বেশী ক'রে খাবেন।

—বেশ, লাগান তাহলে।

বিমল হীরালালবাবুকে চিকিৎসা সুরু করিয়া দিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আর একটি রুগীর ভার আপনাকে নিতে হবে, আমার মেজদা'র।

—কি হয়েছে তাঁর ?

—তাঁর হয়েছে...মানে, . চলুন নিজের চোখেই দেখবেন। তিনি ঐ পেয়ারা-বাগে আছেন। কলকাতার ডাক্তাররা ওঁকে আলাদা থাকতে বলেছেন, চলুন।

মোটরে করিয়াই যাইতে হইল। পোয়ারা-বাগ নিতান্ত কাছে নয়। হীরালালবাবুদের প্রকাণ্ড একটা পেয়ারাবাগান আছে, তাহারই মধ্যে ছোট বাঙলোটির নাম পেয়ারা-বাগ। পেয়ারা-বাগে মতিলাল-বাবু একটি চাকর মাত্র সম্বল করিয়া একাই বাস করিতেছেন।

ঘরে ঢুকিয়াই বিমল বুঝিতে পারিল মতিলালবাবুর কি হইয়াছে। ফোলা নাক, ফোলা কান, ভুরুর উপরও ফোলা, ফোলা ভুরুতে চুল নাই, সিংহের মত মুখভাব—কুষ্ঠ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় নাই। নমস্কার-বিনিময়াদির পর মতিলালবাবু বলিলেন—আমার ব্যায়রাম কি তা দেখেই বুঝতে পারছেন আশা করি। কলকাতা গিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলাম, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁরা একটা ওষুধ খেতে, একটা লাগাতে আর একটা ইনজেকশন করতে দিয়েছেন। জগদীশ-বাবুকে ডেকেছিলাম তিনি আপনার কথাই বললেন! বললেন বুড়ো হয়ে গেছি ওসব ইনট্রাডারমল ইনজেকশন আমার দ্বারা ভাল হবে না, বিমলবাবুকে ডাকুন আপনারা।

বিমল বলিল—কতগুলো ইনজেকশন দিতে বলেছেন ওঁরা ?

—অন্তত একশোটা।

বিমল এখানে আসিলে সাধারণত দশ টাকা করিয়া 'ফি' লয়। একশোটা ইনজেকশন দিতে হইবে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসচক্ষে এক হাজার টাকার অঙ্কটা ভাসিয়া উঠিল। এক হাজার টাকা তুচ্ছ

করিবার মত জিনিস নয়। বলিল—ইনজেকশন দেবার পিচকিরি-টিচকিরি কিন্তু আপনাকে কিনতে হবে, এখানেই থাকবে সেগুলো।

—সব এনেছি আমি।

মতিলালবাবু একটি চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া দেখাইলেন, সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। মতিলালবাবুর চিকিৎসার ভারও বিমল লইল। সেই দিনই একটা ইনজেকশন দিয়া দিল। মতিবাবুর ওখান হইতে ফিরিবার মুখে বিমল হীরালালবাবুকে সাবধান করিয়া দিল।

—আপনি যেন ওখানে যাবেন না বার-বার, আপনার ডায়াবিটিস রয়েছে, আমার উচিত আপনাকে সাবধান ক'রে দেওয়া, ছোঁয়াচে রোগ তো!

হীরালালবাবু বলিলেন—তা জানি সব, কিন্তু নিজের দাদা, তাকে তো ত্যাগ করতে পারি না। একবার অন্তত যেতেই হবে রোজ খোঁজখবর করতে, উনি আবার ভারি অভিমানী লোক।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আরে ছেড়ে দিন মশাই আপনাদের ও-সব থিয়োরি-ফিয়োরি! যিনি যতই সাবধান হন সব মিঞাকেই এক দিন মরতে হবে, মাঝথেকে ছোটলোক হয়ে মরি কেন—

খুত্ খুত্ করিয়া হীরালাল হাসিয়া উঠিলেন, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া গেল এবং চিবুকের নীচে চর্বি থলথল্ করিতে লাগিল। মোটর থামিলে হীরালাল বলিলেন—আপনাকে আর একটি রুগী দেখাব ডাক্তারবাবু, ঠিক রুগী অবশ্য নয়, আসুন—ওরে কমলিকে ডাক—

উভয়ে আবার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। একটু পরেই কমলি আসিল। সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে।

—দেখুন ত একে, মুখময় ব্রণ হয়েছে মশাই কিছুতে সারছে না।

গেলে গেলে মুখময় দাগ ক'রে ফেলেছে। বিয়ের বাজার বুঝতেই পারছেন মুখময় দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেলে বিশ্রী দেখতে হবে, কেউ তখন পছন্দ করবে না।

বিবাহপ্রসঙ্গে কমলি লজ্জিত হইয়া একটু মাথা নীচু করিল।

বিমল ব্রণগুলি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি যাও—

কমলি চলিয়া গেল।

—কি উপায় করা যায় বলুন তো! ইনজেকশন, মলম, লোশন সব রকম হয়ে গেছে।

বিমল নূতন একটা পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিল, সেইটাই লিখিয়া দিল।

—দেখুন এটাতে যদি সারে।

বিমল বাড়ি ফিরিবার মুখে একখানি খামের চিঠি পাইল। মেয়েলি হাতের ঠিকানা লেখা; সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষর। পথেই দাঁড়াইয়া সে চিঠিখানি খুলিল, খুলিয়া বিস্মিত হইল। বিনোদিনীর চিঠি! লিখিয়াছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটি বিশেষ কথা জানবার জন্যেই আপনাকে গোপনে এ চিঠিখানি লিখছি, আশা করি কিছু মনে করিবেন না। আপনার বন্ধু আজকাল দিনরাত্রি দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে চারিদিকে অন্ন-বস্ত্র-চাঁদা সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন, নাইবার খাবার অবসর নেই, বাড়িতে অধিকাংশ দিনই রাত্রে আসেন না। দূরের সব গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়, প্রায়ই ফিরতে পারেন না। আমি যে তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর একটু সাহায্য করব তা তো হবার উপায় নেই জানেন, তিনি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান সব সময় আমি তা জানতেও পারি না। কোথায় থান,

কি খান, কোথায় শোন কিছুই জানি না, সুতরাং ওঁর সম্বন্ধে আমার ভয়ানক একটা দুর্ভাবনা হয়েছে। তার ওপর সেদিন আর একটা জিনিস দেখতে পেয়ে ভয়ানক চিন্তিত হয়েছি আমি। সেদিন বাড়ি এসেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কি একটা ওযুধ খাচ্ছেন, আমাকে দেখতে পেয়ে লুকিয়ে ফেললেন সেটা। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোমার, ওযুধ খাচ্ছ কেন—হেসে বললেন কিছু হয় নি। অনেক ধরাধরি করাতে বললেন, ভাল হজম হয় না ব'লে বিমল একটা হজমের ওষুধ দিয়েছে। ব'লেই বেরিয়ে গেলেন, আজ তিন দিন হ'ল এখনও ফেরেন নি। আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতেই পারছেন। ওঁর কি হয়েছে? দয়া ক'রে আমাকে সব খুলে লিখবেন, কিছু লুকোবেন না। ওঁকে তো চেনেনই, খামখেয়ালী মানুষ, একটা-না-একটা কিছু সর্ব্বদাই নিয়ে মেতে থাকেন। ধর্ম্ম নিয়ে দিনকতক মেতে কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, থিয়েটার নিয়ে দিনকতক কাটালেন, এইবার দুর্ভিক্ষ নিয়ে পড়েছেন। এর পরই কলকাতায় খেলার হিড়িক লাগবে তখন নিশ্চয়ই কলকাতা চলে যাবেন। চারদিকে এত হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ালে শরীর ভাল থাকবে কি ক'রে বলুন তো। আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাল ক'রে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আপনার কথা খুব মানেন। আর আমাকে একটু জানাবেন দয়া ক'রে সত্যি ওঁর কোন অসুখ হয়েছে কিনা। নিশ্চয়ই হয়েছে, তা না হ'লে ওষুধ খাবেন কেন শুধু শুধু। অসুখটা কি সেটা আমি জানতে চাই। আশা করি অবিলম্বে আপনি আমার চিন্তা দূর করবেন। মণিমালাকে নিয়ে আসুন না, আমাদের বাড়ি। মণি ও আপনি আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানবেন। ইতি

বিনোদিনী

হঠাৎ বিমলের মনে হইল পিছন দিকে কে দাঁড়াইয়া আছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল গুপিবাবু কম্পাউণ্ডার, চশমার কাচের উপর দিয়া পত্রটার পানেই চাহিয়া আছেন। বলিলেন—হাসপাতালে একটা 'ফ্র্যাক্চার কেস্' এসেছে।

—কোথায় ভেঙেছে ?

—বাঁ হাতটা।

—চলুন যাচ্ছি, আপনি সব ঠিক করুন গে।

—যে আজ্ঞে।

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল চিন্তিত মুখে চিঠিখানি পকেটস্থ করিয়া হাসপাতালের দিকে নয়, বাড়ির দিকেই অগ্রসর হইল। বড় ক্লান্ত লাগিতেছে। সর্ব্বাগ্রে এক কাপ চা খাওয়া প্রয়োজন। বিনোদিনীকে সে কি উত্তর দিবে! মিথ্যা কথাই কিছু একটা লিখিতে হইবে। রোগীর গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহার স্ত্রীর কাছেও না।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন অমরও আসিয়া পড়িল।

ফ্র্যাক্চারটা বাঁধিয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় মহাসমারোহে হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া, পতাকা উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে অমরের দল ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইল। দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা চাই। বিমলের সহসা মনে হইল ইহাই বাঙালীর চিরন্তন রূপ, যে কোন একটা জিনিসকে উপলক্ষ্য করিয়া সে উৎসব করিবে। হুজুগে না মাতিলে বাঙালী কিছুই করিতে পারে না। দেশের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে একথা প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, কিন্তু ঠিক এই ভাবে দ্বারে দ্বারে চাঁদা চাহিয়া না বেড়াইলে কেহই চাঁদা দিবে না। অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর দুঃখে বিগলিত

হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা পাঠাইয়া দিবে এরূপ লোকের সংখ্যা কম। চাঁদা আদায় করিতে হইবে ; এই আদায় করা ব্যাপারটাকে বাঙালী তাহার স্বকীয় প্রতিভাবলে একটু মনোরম করিয়া লইয়াছে মাত্র।

চাঁদা দিয়া বিমল অমরকে বলিল—তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, তুই কি ঐ দলের সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে ঘুরবি না কি এখন ?

—আমি না ঘুরলেও চলে, ওরাই যথেষ্ট।

তাহলে ওদের যেতে বলে দে, চল্ আমরা একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

—চল্।

বিমল অমরকে বিনোদিনীর পত্রখানি দেখাইয়া বলিল—এই খানিকক্ষণ আগে পেয়েছি! কি ওষুধ খাচ্ছিলি তুই ?

অমর একটা কবিরাজি পেটেণ্ট ওষুধের নাম করিল। বলিল—খেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

—বিনুকে তোমার এখন কি লিখি বল!

—সত্যি কথাটা ছাড়া আর যা খুশী লিখতে পার।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—এমন ক'রে হৈ হৈ ক'রে ঘুরিস কেন, বিনুর কাছাকাছি থাকলে অন্ততঃ সে বেচারা একটু সন্তুষ্ট থাকে! তোদের ওই হারেমের মধ্যে একা একা সে বেচারির কি কষ্ট বল্ তো!

—কি করব বল্, উপায় কি, তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখতে পাই না!

—তা ব'লে দিনরাত বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াবি, বেশ তো!

ম্লান হাসিয়া অমর বলিল—মর্ফিয়া দিয়ে তোরা যেমন শরীরের যন্ত্রণাটা ভুলিয়ে দিস, কাজ নিয়ে তেমনি আমি মনের যন্ত্রণাটা ভুলে

থাকবার চেষ্টা করি। কিন্তু মনে হচ্ছে আর যেন পাচ্ছি না! আমার দোষ হয়েছে তা এক-শ' বার স্বীকার করছি, কিন্তু একবার পা ফস্‌কালেই সারাজীবন ধরে তার শাস্তি চলবে এ যে বড় দুঃসহ ব্যাপার ভাই। এর ওষুধও নেই, ক্ষমাও নেই?

—ক্ষমা আছে কি নেই তা তো তুমি যাচাই ক'রে দেখ নি এখনও, বিনু তো কিছুই জানে না।

অমর নিস্তব্ধ হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বিমল অমরকে বলিল—আমার মনে হয় বিনুকে সব কথা খুলে বলা উচিত। যার সঙ্গে আজীবন বাস করতে হবে তার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা ক'রে চিরকাল চলা শক্ত। তাকে বলাই ভাল।

অমর হাসিয়া বলিল—এখন সে হয় না ভাই, আমি যে এত দিন ভণ্ডামী ক'রে এসেছি, তার কাছে অকলঙ্কিত ধার্ম্মিক ব'লে নিজেকে দেখিয়েছি, হঠাৎ এখন কি ক'রে তাকে বলব যে আমি একটা চরিত্র-হীন ব্যাধিগ্রস্ত লোক—

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—শান্তি পাবার ঐ এক-মাত্র উপায়। পাপকে চেপে রাখতে নেই। আমরা যেমন শরীরের কোথাও পুঁজ হ'লে সেটাকে বের করে দি, তেমনি মনের গ্লানিও বের ক'রে দেওয়া উচিত। তাতে শান্তি পাওয়া যায়।

অমর কিছু বলিল না—দূরদিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। অস্তমান সূর্য্যকিরণে জল-স্থল-আকাশ সুরঞ্জিত। পাল তুলিয়া দুইখানা নৌকা কেমন চমৎকার ভাসিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ একটা নৌকার পাল যদি ছিঁড়িয়া যায়, হঠাৎ যদি ঐ সুরঞ্জিত আকাশপটে কেহ

খানিকটা আলকাতরা লাগাইয়া দেয়, হঠাৎ যদি এই গলিত স্বর্ণবৎ নদীজল পঙ্কিল দুর্গন্ধ হইয়া উঠে—

দূরে হার্মোনিয়াম ও গানের আওয়াজ শোনা গেল।

অমর বলিল—এইবার ওঠা যাক্।

—কোথা যাবি এখন?

—কুবেরগঞ্জ।

—সে তো দশ মাইল এখান থেকে—

অমর একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

৫

বিমলের ইচ্ছা করিতে লাগিল জমিরুদ্দিন সাহেবের মুখের উপর শুনাইয়া দেয় যে আপনার ঐ টাঙানো কম্বলটা তো ঠিক আছে, ওটা তো দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে না, আমি তো ওইটাই রোজ দেখিতেছি! রোগিণীকে দেখিতেই পাই না, তাঁহার ভাল-মন্দের দায়িত্ব কি করিয়া লইব। ইচ্ছা করিল, কিন্তু সত্য সত্যই সে কথা বলিতে পারিল না। আমাদের অধিকাংশ সদিচ্ছাই মনে মনে থাকিয়া যায়—বাঙ্ময় হইতে পায় না। যদিই বা সেটাকে প্রকাশ করিতে পারি, কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। আমরা চিন্তাবীর, কর্ম্মবীর নই।

বনিয়াদি মুসলমান পরিবার; পর্দ্দার খুব বাড়াবাড়ি। রোগী তো বোর্কা পরিয়া আছেই, তাহার বিছানার সামনে প্রকাণ্ড একটা কম্বলও টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রোগী কম্বলের ভিতর দিয়া হাতটা একটু বাহির করিয়া দেয়, বিমল দুটি আঙুল দিয়া নাড়ীটা দেখিবার একটু সুযোগ পায়। ঐ নাড়ী দেখিয়াই যতটুকু হয়। আজ জমিরুদ্দিন

সাহেব বলিলেন যে রোগের অবস্থা ভাল নয়, দিন দিন যেন খারাপই হইতেছে।

বিমলের শুনিয়া রাগ হইল, কিন্তু রাগ সে প্রকাশ করিল না। ভূধরবাবুর কথাটা তাহার মনে পড়িল, আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর এক জন এসে হালে বসবে!

অসুখ সারুক আর না সারুক তাহার তো প্রত্যহ কয়েকটা করিয়া টাকা হইতেছে। অপ্রিয় কয়েকটা সত্য কথা ইহাদের শুনাইয়া দিয়া লাভ নাই। সে যদি রাগ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, আর এক জন আসিয়া ঐ অদৃশ্য রোগীরই চিকিৎসা করিতে বসিবে, এই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারের প্রতিবাদ করিবে না, তাহার স্পষ্টবাদিতার সুযোগ লইয়া স্বচ্ছন্দে তাহার স্থানটি দখল করিয়া বসিবে।

বিমল চিন্তিত মুখে বলিল—সিভিল সার্জ্জন আর লেডী ডাক্তারকে ডাকা দরকার।

—বেশ।

রোগীটিকে যে ভাল করিয়া সর্ব্বাগ্রে দেখা দরকার তাহা বলিয়া লাভ নাই। সেকালের কবিরাজ এবং হকিমরা নাড়ী দেখিয়াই সব কিছু করিতেন, রোগীর হাতে সুতা বাঁধিয়া সেই সুতাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া আগেকার অসাধারণ চিকিৎসকগণ অলৌকিক সব কাণ্ড করিয়াছেন, একালেই বা সমগ্র রোগীটাকে দেখিবার জন্য এ আগ্রহ কেন! একাল-সেকালের তুলনায় একালকেই চিরকাল হার মানিতে হয়। হার মানিয়া চুপ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিমল টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

৬

এক দিন সকালে দাঁতন-হস্তে বদিবাবু আসিয়া দেখা দিলেন।

—ডাক্তার, এবার নন্দী-মহাশয়কে একটু সন্তুষ্ট না করলে চলছে না। সে-বার হেরে গিয়ে উনি বড্ড মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন।

মিউনিসিপালিটির ব্যাপারের বিমল ইদানীং কোন খবরই রাখিত না। সুতরাং সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

—কিসের ব্যাপারে ?

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আহা ঐ যে ইলেকট্রিক স্কীম !

বিমল সঙ্কিত হইয়া বলিল—আবার প্রবন্ধ লিখিতে হবে না কি ?

—না, তার চেয়েও বেশী, ক্যানভাস করতে হবে।

—বলেন কি ?

বদিবাবু বলিলেন—আপনার তো আজকাল সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার। মথুরবাবু, সৌরীনবাবু, হীরালালবাবু, জমিরুদ্দিন, চৌধুরি-মশাই এমন কি হরেন বোস অবধি আপনার করায়ত্ত হয়ে গেছেন, সবাইকে একবার ক'রে ব'লে দেবেন যেন নন্দীকেই ভোট দেয়। এবার হেরে গেলে নন্দী ক্ষেপে যাবে।

বিমল বলিল—আচ্ছা, এই শহরে ইলেক্‌ট্রিসিটি নেবার মতন কি মিউনিসিপালিটির অবস্থা ! গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার করে ! আপনি কি মনে করেন ?

বদিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আমরা উন্মাদ হ'তে পারি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তো আর উন্মাদ নয় ! আমরা অনুরোধ করলেও গবর্ণমেণ্ট টাকা দেবে না। খালি নন্দী মশায়ের মুখরক্ষের জন্যই এ-সব করা আর কিছু নয়। আপনি একটু চেষ্টা করবেন !

—আচ্ছা। মথুরবাবু কিন্তু শুনবেন না আমার কথা !

—এক জন না শুনলে আর কি হবে !

নন্দী-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বদিবাবু অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা বলিলেন—অনেকেরই তো চিকিৎসা করেছেন, এবার আমারও একটু চিকিৎসা করুন।

—কি হয়েছে আপনার?

—আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার কোন অসুখ করেছে? অবশ্য টাকাটাকে যদি অসুখের মধ্যে গণ্য করেন তাহলে—

বদিবাবু অকৃত্রিম আনন্দভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন!

—বেশ বলেছেন এটা,।

তাহার পর আরও খানিকক্ষণ দাঁতন ঘষিয়া বলিলেন—না, শরীরের কিছু গড়বড় হয়েছে, সেদিন পাটনায় সেটা বুঝলাম।

—পাটনায় গিছলেন না কি?

—হ্যাঁ, পাটনা হাইকোর্টে একটা কাজ ছিল। সেদিন পাটনায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মশাই গল্প করছি হঠাৎ একটা টমটমওয়ালা এক ছোট ছেলেকে চাপা দিয়ে ছুট! বদি চাটুজ্যের কাছে এ চালাকিটি চলবার উপায় নেই! আমিও ছুটলাম তার পিছনে, ধরলাম কিছু দূর গিয়ে, খুব উত্তম-মধ্যম দিলাম বেটাকে! চাপা না হয় দিয়ে ফেলেছিস, টমটমটা থামিয়ে ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌছে দে, তা নয় পালাচ্ছিস্। বদি চাটুজ্যের সামনে এ চালাকি চলবে কেন?

বদিবাবু বিমলের মুখের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন।

—ঠিক করি নি?

—ঠিক করেছেন।

—ও ব্যাপার তো মিটে গেল, কিন্তু আমার হাঁপানি আর কিছুতে থামে না মশাই, প্রায় ঘণ্টাখানেক ব'সে হাঁপালাম। আমাদের কলেজের ফুটবল টিমে লেফট্ উইংএ খেলতাম আমি, আমার নাম ছিল ঝড়!

ভীষণ ছুটতে পারতাম আমি, কই সেকালে কখনও এত হাঁপিয়েছি ব'লে তো মনে পড়ে না।

বিমল হাসিয়া বলিল—বয়স বাড়ছে! চলুন আপনার হার্টটা দেখি—আসুন ঐ বাহিরের ঘরটায়—

বাহিরের ঘরটায় ঢুকিবার মুখে কয়েকটা পেঁয়াজের খোসা লক্ষ্য করিয়া বদিবাবু বলিলেন—আপনি খুব মাংস খান শুনেছি—

—প্রত্যহ।

—বলেন কি! শাকসব্জী খান না একেবারে?

বিমল হাসিয়া বলিল—না।

—শুনেছি শাকসব্জীতে খুব ভিটামিন আছে!

—থাকতে পারে কিন্তু আমি ও-সবের ধার ধারি না।

বদিবাবুর হার্টটা দেখিয়া বিমল বলিল—না বিশেষ কিছু নয়; আপনি কিছু দিন বিশ্রাম নিন।

—তা তো আপাতত অসম্ভব! আচ্ছা খবরের কাগজে কিছু দিন আগে হার্ট নিয়ে যে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল—

—ওগুলো পড়বেন না! খবরের কাগজের ঐ সস্তা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো সবাইকে সবজান্তা ক'রে দিয়ে মহা মুশকিলে ফেলেছে আমাদের!

—কেন ওগুলোতে কি ভুল খবর থাকে না কি?

—ভুল ঠিক নয়, কিন্তু পূরো খবর থাকে না! আর ঐ স্বল্প বিদ্যা আহরণ ক'রে ভয়ঙ্কর মুশকিল হচ্ছে, আপনাদেরও আমাদেরও!

বদিবাবু কিছুক্ষণ বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—আমার কোন ওষুধ টষুধ ব্যবস্থা ক'রবেন না কি।

—বিশ্রামই আপনার ওষুধ, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন কিছু দিন!

সে তো অসম্ভব। আচ্ছা, চলি তাহলে!

বদিবাবু চলিয়া গেলে পরেশ-দা আসিলেন।

—তোমার যে আজকাল টিকিই দেখা যায় না হে?

—না থাকলে দেখবেন কি ক'রে! কোথা যাচ্ছেন?

—অমি যাচ্ছি 'হরিমোহন মেমোরিয়াল' কাপের টাইগুলো সব ঠিক করতে! তুমি কমিটিতে আছ জান তো?

—শুনেছি। আমাকে কেন ওর মধ্যে ঢোকালেন শুধু শুধু।

কেন ঢুকাইয়াছেন তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ না দেখাইয়া পরেশ-দা হাসিমুখে বলিলেন—বাঃ, সে কি হয়! হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার বউদির ঐ ওষুধটাই চলিবে না কি!

—জ্বর ছেড়ে গেছে তো?

—কালই।

—আরও চলুক এক দিন।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল বাড়ির ভিতর ঢুকিতে যাইতেছে এমন সময় মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স-কলেক্টার ভুবনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—ওহে ডাক্তার, আমার সর্ব্বাঙ্গ যে খোসে ভরে গেল, একটা কিছু ব্যবস্থা কর ভাই। রক্তটাকে যদি পরীক্ষা করতে চাও তাই না হয় কর, আর তো পেরে উঠছি না।

বিমল দেখিয়া বলিল—কি ওষুধ লাগাচ্ছেন?

—সব রকম লাগিয়েছি, গাঁজার তেল, গন্ধক, শেয়ালকাঁটা গাছের শেকড়, আলকাতরা, তুঁত—

বিমল হাসিয়া ফেলিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—তুমি তো এ অঞ্চলে ইন্‌জেকশন-সম্রাট হয়ে উঠেছ, তাই তোমার কাছে এলাম, যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার!

বিমল বলিল বেশ, আজ হাসপাতালে যাবেন, একটা ইনজেকশন দেব আপনাকে। কিন্তু আমার হাসপাতালের ওষুধ যে আবার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, এইবার আপনি কিছু ট্যাক্‌স্ আদায় ক'রে দিন। হয়েছে কিছু ট্যাক্‌স্ আদায়? এত দিন তো আমি ভিক্ষে ক'রে চালালাম—

ভুবনবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন—ট্যাক্‌স্ কাদের বাকী জান?

—কাদের?

—ঐ সব হোমরা-চোমরাদের! এক মথুরবাবু ছাড়া আর সকলের কাছে ট্যাক্‌স্ পাওনা রয়েছে! কিন্তু ওঁরা মালিক, ওঁদের কাছে তো আর বার-বার তাগাদা করতে পারি না। নন্দী-মশায়কে একটু তাগাদা করেছিলাম, তিনি এমন ভাবে চোখ গরম ক'রে চাইলেন আমার দিকে যে আমার পিত্তি শুকিয়ে যাবার জোগাড়!

বিমল এ-কথা জানিত না, চুপ করিয়া রহিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—যত তম্বি গরীবদের উপর, তারা ট্যাক্‌স না দিলে তাদের ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি বিক্রী কর, অথচ ওঁদের যে প্রত্যেকেরই এক কাঁড়ি ক'রে বাকি রয়েছে সেদিকে কারও দৃকপাত নেই।

বিমল বলিল—আচ্ছা হাসপাতালে চলুন আপনি, আমি যাচ্ছি একটু পরে!

ভুবনবাবু বৃদ্ধ লোক। বিমলকে খুব স্নেহ করেন। তাই বোধ হয় এই গোপন কথাগুলি বলিলেন। গমনোন্মুখ বিমলকে ডাকিয়া

আবার বলিলেন—এ-সব কথা যেন প্রকাশ না পায়, দেখো! কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি—চাকরিটা গেলে খেতে পাব না!

—না, না, আমি কাউকে কিছু বলব না।

৭

সুপ্রিয়া সরকারকে ইন্‌জেকশন দিতে গিয়া বিমল দেখিল বাহিরের ঘরটাতে এক সুব্রতবাবু ছাড়া আর কেহ নাই। এই শীর্ণকায় উন্নতনাসা লোকটাকে দেখিলে বিমলের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। সুব্রতবাবু পড়িতেছিলেন বিমলকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া আসিলেন,—ও আপনি এসে গেছেন। সুপ্রিয়ারা এখানে কেউ নেই, সব হীরালালবাবুদের বাড়ীতে গেছে। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন, আজ সেটা আমরা আন্দাজই করতে পারি নি। বসুন, খবর পাঠাই একটা—

বিমল উপবেশন করিল, সুব্রতবাবু বাহির হইয়া গেলেন। ভদ্র-লোকের কথায় বার্তায় ব্যবহারে বেশ সুমার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, লেখাপড়াও জানেন, প্রথম শ্রেণীর এম্, এ, যখন, নিশ্চয়ই জানেন, অথচ কেমন যেন একটা শ্রীহীন ভাব ভদ্রলোকের! দেখিলেই মন বিমুখ হইয়া যায়। একটি চাকরকে বাইসিকেল-পৃষ্ঠে রওনা করিয়া দিয়া সুব্রতবাবু আবার আসিয়া বসিলেন।

—আচ্ছা, সুপ্রিয়াকে কি রকম দেখছেন বলুন ত! কাল আবার প্যালপিটেশন হয়েছিল খুব।

—তাই না কি?

বিমল চিন্তিত হইয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

সুব্রতবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ওর অসুখটা কি বলুন ত?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—একটা কথা বলব যদি না মনে করেন!

—কি বলুন।

—আপনার সন্তান না হ'লে অসুখ সারবে না।

সুব্রতবাবু খানিকক্ষণ বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—কিন্তু মুশকিল এই যে সুপ্রিয়া ছেলে চায় না!

—কেন?

সুব্রতবাবু ইহার উত্তরে অনেকক্ষণ কিছু বলিলেন না, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা একটু হাসিয়া বলিলেন—আমার বিয়ে করাই ভুল হয়েছিল।

বিমল মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অজ্ঞাতসারে হয়ত কোন বেদনার স্থানে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে। তবু সে প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না।

—কি হিসেবে ভুল বলছেন?

—সে আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি ঘর-জামাই নন!

সুব্রতবাবু যে ঘর-জামাই বিমল তাহা জানিত না, মনে মনে বিস্মিত হইয়া গেল। বাহিরে কিন্তু হাসিয়া বলিল—তাতে কি হয়েছে!

—অনেক কিছু হয়েছে। তার জন্যেই সুপ্রিয়া ছেলে চায় না, বলে শঙ্করাকে ডেকে আর দরকার নেই, নিজেদের ঠাঁই হয়েছে তাই যথেষ্ট!

বিমল বলিল—বেশ তা আলাদা থাকুন আপনারা, এখানে থাকবার দরকার কি?

সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া সুব্রতবাবু বলিলেন—চেষ্টা করছি না ভাবছেন, কিন্তু হচ্ছে না—কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পারছি না। এম,

এ,তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েও কিছু সুবিধে হয় নি। একটা কলেজে চাকরি খালি হয়েছে, দরখাস্ত ত করেছি, দেখি যদি হয়। ভরসা কিছু নেই, জীবনে অনেক দরখাস্তই করেছি অনেক জায়গায়।

সুব্রতবাবু হাসিলেন। করুণ হাসি!

—কোন্ কলেজে?

সুব্রতবাবু কলেজের নাম বলিলেন। কি আশ্চর্য্য বিমলের শ্বশুরই যে সে কলেজের প্রিন্সিপাল! সেকথা বলিতেই সুব্রতবাবুর চোখে মুখে যেন আলো জ্বলিয়া উঠিল। অবিন্যস্ত কেশভার বাঁ-হাত দিয়া কপালের উপর হইতে সরাইয়া তিনি বলিলেন—একটু চেষ্টা করবেন দয়া ক'রে।

—নিশ্চয়! কলেজ-কমিটির আরও দু-এক জনের সঙ্গে আলাপ আছে আমার, কালই চিঠি লিখব আমি।

—চলুন না যাই এক দিন। চিঠিপত্রর লিখে এসব ব্যাপার তেমন ঠিক হয় না। সুপ্রিয়াকে আর এক বার কলকাতা নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল, চলুন না সব যাই একসঙ্গে।

—যাওয়া মুশকিল।

—না না, চলুন ডাক্তারবাবু প্লীজ—

দুই হাত দিয়া সুব্রতবাবু বিমলের হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিলেন। শীর্ণ শিরাবহুল হাত দুইখানার দিকে চাহিয়া বিমল "না" বলিতে পারিল না। বলিল—চেষ্টা করব। ছুটি না পেলে ত যেতে পারি না। আমারও ত চাকরি—

—আপনার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবার ভার আমি নিচ্ছি। কাকাবাবু ঐ ওধারের বারান্দায় আছেন, চলুন তাঁকে গিয়ে এখুনি বলি,—তিনি চেষ্টা করলে হয়ে যাবে।

—সৌরীনবাবু আছেন না কি বাড়ীতে?

—আছেন, আসুন।

সুব্রতবাবুর পিছনে পিছনে বিমল বারান্দায় গিয়া হাজির হইল। বারান্দার এক প্রান্তে একটি সুদৃশ্য চেয়ারের উপর সিগার-হস্তে সৌরীন-বাবু বসিয়াছিলেন, সম্মুখে একটি মিস্ত্রি বসিয়া কি যেন প্রস্তুত করিতে-ছিল। পদশব্দ শুনিয়া সৌরীনবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইলেন এবং বিমলকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আসুন আসুন, কতক্ষণ এসেছেন, ওরে ফকির চেয়ার বার কর।

বিলল দেখিল প্রকাণ্ড একটা খাঁচার মতন কি যেন প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু ছোটবড় নানা মাপের এতগুলো আয়না কেন! গোল, তিন-কোণা, চৌকোণা নানা রকম আয়না।

—এ-সব কি?

সৌরীনবাবু সিগারে মৃদুগোছের একটা টান দিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, আমাদের হীরেমনটার মাথা খাবার চেষ্টা করছি!

—তার মানে?

—তার মানে ওর একটা বড়গোছের খাঁচা তৈরি করিয়ে তাতে নানা রকম আয়না 'ফিট ক'রে দিচ্ছি। মানুষের সঙ্গে যখন বাস করছে তখন অতটা নিশ্চিন্ত ওকে থাকতে দেব কেন? কি বল সুব্রত! নিজেরই ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া ভাব যা হোক একটা কিছু করুক, আমরা দেখি। পাখীর মুখে কেষ্ট নাম শুনে কি আর চারটে হাত বেরুবে! তার চেয়ে ও যদি আয়নায় নিজের ছায়াটার সঙ্গে ঝাপটাঝাপটি করে, দেখে সুখ হবে খানিকটা! কি বলেন ডাক্তার বাবু!

ভদ্রলোকের উদ্ভাবনীশক্তি দেখিয়া বিমল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সৌরীনবাবু বলিলেন—শুধু নিজের ছায়াই নয়, বাইরের অনেক কিছু দেখেও অকারণে ভয় পাবে কিংবা খুশী হবে। বেরালের ছায়া

দেখে ভাববে, ওই রে বুঝি বেরাল খাঁচার ভেতরে ঢুকেচে—প্রাণপণে চেঁচাবে। অন্য একটা পাখীর ছায়া পড়লে আশ্চর্য্য হয়ে ভাববে, এ আবার কোথা থেকে এল! কিংবা হয়ত কিছুই করবে না, মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকবে—দেখাই যাক্। নানা রকম আয়না ত এনে জোটানো গেছে! ও যদি একদম কিছুই না করে তাহলে আপনাকে একদিন 'কল' দিতে হবে!

—আমাকে? কেন!

—ওকে তাহলে একটু মদ খাওয়াব, মাত্রাটা ঠিক ক'রে দেবেন আপনি! সুস্থমস্তিষ্কে যদি ও কিছু না করে. মাতাল হ'লে করতে পারে!

—পাখীটাকে শুধু শুধু ব্যতিব্যস্ত করচেন কেন?

—কারণ আমি মানুষ!

সৌরীনবাবুর সমস্যা এবং সুব্রতবাবুর সমস্যা এতই বিভিন্ন রকমের যে সুব্রতবাবুর কথাটা চট করিয়া পাড়া গেল না। বদিবাবুর কথাটাও বিমলের মনে পড়িল। পাঁচ রকম কথায় পাছে কথাটা ভুলিয়া যায় সেই জন্য বলিল—আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

—কি বলুন।

—এবার মিউনিসিপাল মিটিঙে আপনার ভোটটা নন্দীমশায়কেই দেবেন।

—বেশ, ফকির আমার ডায়েরিটা নিয়ে এস ত। কবে মিটিং?

—২৭শে।

ফকির নামক ভৃত্যটি ডায়েরি আনিল. সৌরীনবাবু লিখিয়া লইলেন।

বিমল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বিষয়ে ভোট, কিসের মিটিং কিছুই জিগ্যেস করলেন না যে বড়!

—আজ পর্যন্ত জীবনে কোন জিনিসের ভাল মন্দ বিচার ক'রে ভোট দিই নি। বরাবর অনুরোধে পড়ে দিয়েছি। যে প্রথমে অনুরোধ করে তাকেই ভোট দিই, যদি কেউ অনুরোধ না করে কোন পক্ষেই দিই না। কি বিষয় কি বৃত্তান্ত তা নিয়ে মাথা-ঘামানো সুতরাং বৃথা। সবারই বোধ হয় আমার মত দশা ঃ এ যুগে স্নেহের বরং চোখ আছে, ভোট একেবারে অন্ধ!

মোটর থামিবার শব্দ পাওয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়ার মা ও সুধীর আসিয়া হাজির হইলেন। সুপ্রিয়ার মায়ের হাতে অসমাপ্ত সোয়েটারটা রহিয়াছে, এখনও শেষ হয় নাই। সেটার দিকে চাহিয়া সৌরীনবাবু মন্তব্য করিলেন, ওটা শেষ হ'লে কি করবে বোউদি ভেবে রাখ এখন থেকে! আমার মোজা, কমফর্টার, সোয়েটার' সুপ্রিয়ার ব্লাউস, মাফলার সব ত হ'ল, সুব্রতরও ত কি একটা হয়েছে!

ভগবতী দেবী দেবরের এ-সব মন্তব্যের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে কবেন না, তিনি একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং আপন মনে বুনিতে লাগিলেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—আমার যদি বুদ্ধি নাও একটা নতুন জিনিষ বাতলাতে পারি। এই সোয়েটারটা হয়ে গেলে উল-টুলের ভেতর আর যেও না তুমি! আমাদের যে ঐ গ্রামোফোনটা আছে, নিছক গান শোনান ছাড়া ওটার ত আর কোনই কাজ নেই, ঐ মেশিনটাকে যদি কোন কাজে লাগাতে পার মন্দ হয় না। ধর যদি ওতে আরও কিছু জুড়ে-টুড়ে এমন করা যায় যে দম দিয়ে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে গানও হবে, সঙ্গে ঘোল মওয়াও হবে, কিংবা ঐ রকম একটা কিছু—

ভগবতী দেবী উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রিয়া বলিলেন—কি যে আপনি কাকাবাবু, খালি খালি মাকে রাগাবেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—তোরা বুঝিস না, ওতে তোর মা খুশী হয়। না করলেই চটে যাবে। বাল্যকাল থেকে এ-কাজ করছি, আমাদের দু-জনের পরিচয় প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যে, সে-কথা ভুলে যাস কেন!

বিমল বলিল--চলুন আপনার ইনজেকশনটা সেরে ফেলি।

—আপনাদের জ্বালায় আর পারি না আমি।

সৌরীনবাবু ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চক্ষু বুজিয়া সিগারে একটি মৃদু টান দিলেন।

ইনজেকশন শেষ করিয়া বিমল বাহিরে আসিতেই সৌরীনবাবু বলিলেন—সুব্রত কাজের লোক হয়ে উঠতে চাইছে, শুনেছেন?

—শুনেছি।

—এটা অহমিকার লক্ষণ, সুতরাং দুর্লক্ষণ, কি বলেন?

বিমল কিছু বলিল না, একটু হাসিল মাত্র।

—শুধু হাসিলে চলবে না; হাঁ-না কিছু একটা বলুন, তর্ক অন্ততঃ একটা জমে উঠুক। বসুন।

বিমল বলিল—না আর বসব না, কাজ আছে আমার!

—কাজের লোক হওয়ার এই একটা প্রধান দোষ; সুব্রতও দিনকতক পরে ওই হয়ে পড়বে!

বিমল বলিল—সুপ্রিয়ার অসুখ সারাবার জন্যেই সুব্রতবাবুর চাকরি নেওয়া উচিৎ!

—মানে ইনজেকশনে কিছু হবে না?

—আমার ত মনে হয় না!

সৌরীনবাবু হতাশভাবে বলিলেন—ডাক্তারের প্রেসক্রুপশনের উপর ত হাত নেই!

সুপ্রিয়া সরকারকে ইনজেকশন দিয়া বিমল হীরালালবাবুর ওখানে গিয়াছিল। সেখানে হীরালালবাবু এবং মতিলালবাবুর ইনজেকশন দেওয়ার কথা ছিল। ইনজেকশনেরই যুগ পড়িয়াছে! ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইনজেকশন দিতে হয়। হীরালালবাবু ইনজেকশন লইয়া অনেকটা ভাল আছেন, কিন্তু মতিবাবুর ত কোন উন্নতিই হইতেছে না। ভদ্র-লোকের ওখানে বেশীক্ষণ বসিতে ইচ্ছা করে না, অথচ ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়িতে চান না। এই কুষ্ঠরোগীদের অপরের সহিত মাখামাখি করিবার দিকে কেমন যেন একটা ঝোক আছে! কত রকম লোকের সহিতই ডাক্তারদের রোজ সাক্ষাৎ হয়, কত রকম লোকের সমস্যা। সুপ্রিয়া, সুব্রত, সৌরীনবাবু, ভগবতী দেবী, নন্দীমহাশয়, অমর, বিনোদিনী প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সমস্যা! রাস্তায় ধূলা উড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাসে মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে, নিদাঘ দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে, বিমল একা বসিয়া ভাবিতেছে, বুক-পকেটটা টাকার ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা বিমলের নজরে পড়িল ডান দিকের মাঠে গাছতলায় একটা লোক যেন পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটা যে আরাম করিয়া এই দুপুরে ওখানে শুইয়া আছে তাহা ত মনে হয় না। শুইবার ভঙ্গীটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক, যেন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে! বিমল মোটর থামাইতে বলিল। কাছে গিয়া যাহা সে দেখিল তাহাতে সে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। প্রচুর রক্ত জমিয়া শুকাইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই উপর মুখ গুঁজিয়া জরাজীর্ণ অস্থিপঞ্জরসার একটা লোক উপুড়

হইয়া পড়িয়া আছে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত, এই উত্তপ্ত নিষ্করুণ ধরণীকেই সে দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বিমল একটু ঝুঁকিয়া তাহার নাড়ীটা দেখিল—কোন স্পন্দন নাই! আর একটু ঝুঁকিয়া বাঁ-হাত দিয়া তাহার মাথাটা সরাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল! এ কি, এ যে সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারী বুড়োটা যাহাকে সে এক দিন চড় মারিয়া হাসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ভিখারীর সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিবে, কি করিবে কিছুই তাহার মাথায় আসিল না। সহসা তাহার চমক ভাঙিল। ড্রাইভারটা বলিতেছে—ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে ওর!

—মরে গেছে!

ড্রাইভার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাহলে আর কি হবে! চলুন। আমাকে আবার চারটের সময় সোয়ারি দিতে হবে। দিদিরা সতীশবাবুর ওখানে যাবেন, সেখানে জলসা আছে!

ঠিক তো! তাহারও সেখানে নিমন্ত্রণ আছে! কলিকাতার এক বিখ্যাত নর্তকী মাত্র এক রাত্রির জন্য আসিয়াছেন!

মোটরে উঠিয়া বিমল বলিল—জোরে চালাও।

আইনতঃ তাহার থানায় খবর দেওয়া উচিত থানার দারোগার উচিত মৃতদেহটাকে সদরে পাঠানো, সদরের ডাক্তারের উচিত মৃতদেহটাকে চিরিয়া ফাড়িয়া সন্তোষজনক বিবৃতি প্রকাশ করা। শিয়াল-কুকুর-শকুনিতে ছেঁড়াছিঁড়ি না করিয়া এক জন কৃতবিদ্য ডাক্তার সেটা করিবে, হয়ত কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তবু বিমল মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারটার হাতে দশ

টাকার একখানা নোট দিয়া বলিল—এই টাকা দশটা দিয়ে তুমি ঐ লোকটা যাতে গঙ্গা পায় তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হইয়া গেল।

বিমল বলিল—হীরালালবাবুকে আমার নাম ক'রে ব'লো, তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। খরচটা আমিই দিচ্ছি! ওতে কুলুবে ত?

ড্রাইভার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—টাকাটা আপনি রাখুন ডাক্তারবাবু, আমি টাকা নিয়েছি শুনলে ছোটবাবু আমার উপর রাগ করিবেন!

—না, না কিছু না, আমার নাম ক'রে ব'লো তুমি।

বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া পারঘাটার নৌকায় চড়িল।

বাড়ী পৌছিয়া দেখিল আর এক সমস্যা! মণিমালার পা পুড়িয়া গিয়াছে। ফুটন্ত দুধের কড়াটা নামাতে গিয়া হাত ফসকাইয়া এই কাণ্ড। আরও এক মুশ্‌কিল হইয়াছিল, ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। জগদীশবাবু, ভূধরবাবু সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, অবশেষে রেলের ডাক্তার জগুবাবু আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, দুলু নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাঁহাকেই ডাকিয়া আনিয়াছিল। বিমল দেখিল জগুবাবু সুব্যবস্থাই করিয়াছেন, এমন কি ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক একটা সিরাম পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন; সবই হইয়াছে কিন্তু বিমল মনে মনে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। রাঁধুনী বামুন রাখা লইয়া মণির সহিত তাহার গোড়ায় গোড়ায় বেশ ঝগড়া হইয়া গিয়াছিল, বিমল ইচ্ছা করিয়াই রাঁধুনি রাখে নাই, দুইজনের মাত্র রান্না তার জন্যে ও'রাধুনী! তাহার চেয়ে হোটেল হইতে আনাইয়া খাইলেই হয়। মণি যে হঠাৎ

পুড়িয়া যাইতে পারে এ সম্ভাবনাটার কথা তাহার মনেই হয় নাই। তাহার উপর সে অন্তঃসত্ত্বা! বিমল বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। যদিও জ্বালা অনেক কমিয়াছে, তবু নানা রকম উপসর্গ হইতে পারে। মণির দিকে বিমল চাহিয়া দেখিল মণির চোখে একটা দুষ্টমিভরা হাসি উঁকি দিতেছে, ভাবটা যেন রাঁধুনী রাখতে চাও নি যে, কেমন হয়েছে এবার!

৮

মণিমালা ভাল হইয়া গেল।

মণিমালা ভাল হইয়া গেল বটে, কিন্তু ঘোষেদের বাড়ীর যে-মেয়েটি পুড়িয়া গিয়াছিল সে আর ভাল হইল না। সে বাঁচিতে চাহেও নাই, চাহিলে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া তাহা কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া নিজ হাতে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিত না! সতর-আঠারো বছরের অবিবাহিতা মেয়ে, নানা কারণে জীবন তাহার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ কথাগুলি বিমলের কাণে বাজিতেছিল,—আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তারবাবু, আমাকে তুমি যেন বাঁচিয়ে দিও না গো!

এই ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়, প্রায়ই শোনো যায়। তবু বিমলের মনটা কেমন যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। নন্দী-মহাশয়ের পুত্র রমেনের নাম মেয়েটার সহিত যুক্ত করিয়া যে-সব কুৎসা রটিতেছে তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি বিমলের ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল আমরা কোথায় চলিয়াছি! আমাদের এত শিক্ষা-দীক্ষা, বক্তৃতা-আড়ম্বর কোন কিছুই ত মনের গুহাবাসী পশুটার নখ-দন্তের তীক্ষ্ণতা এতটুকু কমাইতে পারিতেছে না। বরং নানা ছুতায়

আমরা সেই নখদন্তকে শাণিততর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। আজকাল এই যে ঘরে ঘরে মারি স্টোপ্‌স্‌, ফ্রয়েড এবং হ্যাভেলক এলিস পড়ার ধুম—তাহা কি কেবল নিছক জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য? এই যে আজকাল পথে ঘাটে অশ্লীল গল্প-কবিতার ছড়াছড়ি এ কি নিছক সাহিত্য-প্রীতির জন্যই? এই যে দলে দলে লোক সিনেমায় নাচে যায়, এই যে রাশি রাশি অশ্লীল ছবি গোপনে ও প্রকাশ্যে ক্রীত-বিক্রীত হয় ইহা কি নির্জলা আর্টপ্রীতি ছাড়া আর কিছু নহে? আমরা নানা উপায়ে পশুটাকে লোলুপ করিয়া তুলিতেছি, অথচ তাহার আহার জুটাইবার সঙ্গতি ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না, অভদ্রভাবে অসদুপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নানা ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ছদ্মবেশটা ধরা পড়িয়া গেলে অনেক সময় লজ্জিত হই বটে, কিন্তু সেটা চক্ষুলজ্জা, সামাজিক লজ্জা আন্তরিক নৈতিক লজ্জা নহে। নীতি আবার কি! বাঁচিয়া থাকা এবং যত দূর সম্ভব জাঁকজমক করিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই ত শ্রেষ্ঠ নীতি! সকলেই বুদ্ধিমান্‌, সকলেই বুদ্ধির আলোক দিয়া সব জিনিষ যাচাই করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে এবং তাহারই জোরে ভগবান্‌ ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কারগুলিকে অনায়াসে বাতিল করিয়া দিয়াছে। যে অন্ধবিশ্বাসের বলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাপ-কর্ম্ম হইতে বিরত এবং পুণ্যকর্ম্মে নিরত থাকিতে চেষ্টা করিতেন, সে অন্ধবিশ্বাস ত আর নাই। আজকাল সকলেই চক্ষুষ্মান—সকলেই প্রত্যেক জিনিসটার লাভ-ক্ষতি খতাইয়া দেখিতে জানে। প্রাচীন ধাপ্পায় আজকাল আর কেহ ভোলে না! বিবাহ আজকাল অবশ্য-করণীয় সামাজিক কর্ত্তব্য নহে, বিবাহ আজকাল ইচ্ছাধীন ব্যাপার। নানা দিক্‌ দিয়া অঙ্ক কষিয়া যদি সুবিধাজনক মনে হয় তবেই লোক

বিবাহ করে, সাধ করিয়া এত বড় দায়িত্ব কে লইতে যাইবে, কেহই লইতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে হয়ত বাড়্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলাও কাটিয়া ফেলিয়া মানুষ নিজেকে আরও হাল্কা করিয়া ফেলিবে, দেহরক্ষার জন্য এখন যতটা খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন ততটা হইবে না। সব জিনিসই লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে ওজন করাই বৈজ্ঞানিক রেওয়াজ। ঘরে ঘরে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য ফলও ফলিতেছে! নারীরা জননী বলিয়াই তাহাদের শাস্তি বেশী। আমরা জননী লইয়া কবিতা লিখি, উচ্ছ্বসিত হই, কিন্তু জননীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাই না, বরং মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দিই। ব্যভিচারী পুরুষ দরিদ্র হইলে তাহায় নিন্দা করি, হয়ত শাস্তিও দিই, কিন্তু ধনী হইলে চুপ করিয়া থাকি এবং প্রয়োজন হইলে পূজাও করি। অর্থাৎ আজকাল সমাজে টাকাই ভগবান, কুবেরেরই জয়-জয়কার! বিমল ভাবিতে লাগিল সে নিজেই বা কি করিতেছে! সে-ও কি কুবেরেরই উপাসনা করিতেছে না? কই আজকাল ত সে আব আগেকার মত ঠিক সময়ে হাসপাতালে যায় না। এ-পারের 'কল'গুলা সারিয়া হাসপাতালে পৌছিতে প্রায়ই তাহার ন-টা সাড়ে ন-টা বাজিয়া যায়। গুপিবাবুকে সে বলিয়া দিয়াছে যে, পুরাতন রোগীগুলার ঔষধ যেন তিনি 'রিপিট' করিয়া দেন অর্থাৎ পুরাতন ঔষধই যেন আবার দিয়া দেন। প্রথম যেদিন সে গুপিবাবুকে এ-কথা বলিয়াছিল এবং এ-কথা শুনিয়া গুপিবাবু তাঁহার চশমার কাচের উপর দিয়া যে-ভাবে বিমলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, তাহা বিমলকে লজ্জিত করিয়াছিল! গুপিবাবুর সে নীরব দৃষ্টি যেন ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিতেছিল—এই যে এইবার মুখোসটা খুলিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি! প্রথম-প্রথম সকলেই অমন ভাল-গিরি ফলায়,

বাহাদুরিটা শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু টিকে না। এই বয়সে অনেক দেখিলাম। মুখে কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন—যে আজ্ঞে, তাই করব। সেদিন ওপারে একটা 'কল' ছিল, অনেকগুলা কালাজ্বর রোগীর ইনজেকশনও বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে দিতে গিয়া দুইজন রোগীর শিরার বাহিরে পড়িয়া গেল। ভীষণ যন্ত্রণা। গুপিবাবু এবং জানকীর ধমকের চোটে বেচারারা স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেও পারিল না। সেদিন একটা টিউমার কাটিয়াছে, সেপটিক হইবার কথা নয় কিন্তু সেটা সেপটিক হইয়া গিয়াছে, পুঁজ দেখা দিয়াছে, জ্বর হইতেছে! কই, আগে ত এমন সেপটীক হইত না! আগে সে নিজে যত্ন করিয়া ড্রেস করিত, এখন যা করে দুলু। ঐ শূয়ারে-চেরা রোগীটার কিন্তু ভাগ্য ভাল, সে ভাল হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য তাহার পেটের মাঝামাঝি একটা হার্ণিয়ার মত হইয়া থাকিবে, তা থাকুক, প্রাণে ত বাঁচিয়াছে! ছেলেটির নাম কাঙালী। সে বলিতেছে যে বিমলকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবেনা না, বিমলই তাহার জীবন বাঁচাইয়াছে, বিমলের সেবাতেই সে জীবনটা নিয়োজিত করিবে। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, সে সচ্ছন্দে থাকিবে। বেতন চাই না, শুধু দুটি খাইতে পাইলেই যথেষ্ট।

—ডাক্তারবাবু ?

—কে ?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল নন্দী-মহাশয়ের এক জন কর্ম্মচারী।

—কি ?

—গুরুঠাকুরের জ্বর হয়েছে কাল থেকে, আপনি একবার চলুন, ভূধরবাবু জগদীবাবু ব'সে আছেন।

—চল।

ভৈরবের স্ত্রীও এক পাশে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কোলে

ছোট একটি শিশু। সে বলিল যে ছেলেটির দুইদিন হইতে জ্বর হইয়াছে, সে কম্পাউণ্ডার বাবুর নিকট হইতে অবস্থা বলিয়া দুই দিন ঔষধ লইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবস্থা যেন ক্রমেই খারাপ হইতেছে, ডাক্তারবাবু যদি একটু দয়া করিয়া দেখেন—

নন্দী-মহাশয়ের কর্ম্মচারিটি বলিলেন—এখন ডাক্তারবাবু আমাদের ওখানে যাচ্ছেন, পরে আসিস।

বিমল তাহাকে বলিল—তুমি হাসপাতালে যাও, নন্দী-মশায়ের ওখান থেকে ঘুরে এখুনি যাচ্ছি আমি।

নন্দী-মশায়ের বাড়ীতে গিয়া বিমল দেখিল আবহাওয়া বেশ গুরুগম্ভীর। নন্দী-মহাশয়ের গুরুদেব এই প্রথম তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন এবং আসিয়াই জ্বরে পড়িয়া গিয়াছেন। নন্দী-মহাশয়ের মাথায় যেন বজ্রপাত হইয়াছে। বিমল আসিতেই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া পশ্চাতে বীজননিরত ভৃত্য দুইটিকে আরও জোরে বাতাস করিবার ইঙ্গিত করিলেন এবং তাহার পর ডাক্তার তিন জনের দিকে বাষ্পাকুল নয়নে চাহিয়া বলিলেন—এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন আপনারা!

গুরুদেব এ কি পরীক্ষায় ফেললেন আমাকে!

জগদীশবাবু বলিলেন—কাতর হয়ে ত লাভ নেই, ব্যায়ারাম তার নিজের রাস্তায় ঠিক যতক্ষণ চলবার তা চলবে।

বিমল বলিল—ক-দিনের জ্বর?

নন্দী-মশায় বলিলেন—প্রকাশ পেয়েছে কাল থেকে, উনি ত সহজে কিছু বলেন না, আমার বিশ্বাস কয়েক দিন আগে থেকেই হয়েছে!

ভূধরবাবু বলিলেন—ইনফ্লুয়েঞ্জা-গোছের মনে হচ্ছে!

জগদীশবাবু ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া কপালের চামড়া কুঁচকাইয়া

ছাতের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা হাসিয়া বলিলেন—তা কি বলা যায় চট ক'রে !

কথাটা বলিলেন ভূধরবাবুকে, কিন্তু চাহিলেন বিমলের দিকে। বিমল দেখিল তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি সন্তর্পণে উঁকি মারিতেছে। অদ্ভুত তাঁহার এই জিবটি !

ভূধরবাবু বিমলকে বলিল—যান আপনি দেখে আসুন, তার পর সবাই মিলে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে।

মূল্যবান পালঙ্কে মহার্ঘ শয্যায় শায়িত এই বলিষ্ঠ বিপুলকায় ব্যক্তিটিকে খুব পীড়িত বলিয়া ত বিমলের বোধ হইল না। :জ্বর হইয়াছে বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। বিমলকে দেখিয়া গুরুঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও সশব্দে বার-দুই হাঁচিয়া বিমলের দিকে আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—আপনিও কি ডাক্তার নাকি ?

নন্দী-মহাশয়ের প্রৌঢ়া পত্নী শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন, মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া ছিল, তিনি ফিসফিস করিয়া বিমলের পরিচয় দিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন—ও, আসুন, বসুন। এই ত দু-জন দেখে গেলেন ! রাখাল বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেখছি !

প্রথামত বিমল গুরুঠাকুরের বুক পিঠ পেট জিব চোখ সবই দেখিল, বিশেষ কিছুই পাইল না। তাহারও ধারণা হইল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাই হইয়াছে। তাঁহার দেখা হইয়া গেলে গুরুঠাকুর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—কি রকম দেখলেন খাঁচাখানা !

—ভালই !

—আদা দিয়ে এক কাপ চা খেতে পারি ?

—বেশ ত খান না।

নীচে যাইতেই ভূধরবাবু বলিলেন—কি রকম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নয় ?

—তাই ত মনে হচ্ছে, তবে—

বিমল কথাটাকে ইচ্ছা করিয়াই সম্পূর্ণ করিল না। জগদীশবাবু বলিলেন—পিঠের নীচের দিক্‌টায় দেখেছেন ডান দিকে ? খুব ফাইন ক্রিপিটিশনের মত রয়েছে—

বিমল শুনিতে পায় নাই তবু বলিল—হ্যাঁ তা ত আছে। তা থাকা আর অসম্ভব কি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাল নিমোনিয়া হ'তে পারে তা যদি হয় বড় সঙীন ব্যাপার !

—নয় কি ?

জগদীশবাবু হাসিয়া ভূধরবাবুর দিকে চাহিলেন।

নন্দী-মহাশয় বলিলেন—দেখুন, ওসব ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই আমি। উনি আমার গুরুদেব, ওঁর চিকিৎসা-বিষয়ে আমি কোন প্রকার খেদ, রাখতে চাই না, দরকার মনে করেন কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান আপনারা। ওপারের মথুরবাবুর ভায়রাভাই দুর্লভবাবুও এঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। এক বার সেই দুর্লভবাবুর বাড়ীতে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, তিনি একটা ডাক্তার ডাকেন নি। নিজে বই দেখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছিলেন ! নারায়ণের কৃপায় বাড়াবাড়ি কিছু হ'ল না তাই, যদি হ'ত কি করতিস তুই ? দুঃখ রাখবার জীবনে জায়গা পেতিস ?

জগদীশবাবু অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিয়া বলিলেন দেখুন নন্দী-মশায়, (কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে ! ভাল জিনিস পৃথিবীতে বেশী থাকে না, থাকতে নেই।)

পুলকিত নন্দী-মহাশয় লাল গামছাটি দিয়া বগলের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—অত প্রশংসার যোগ্য অবশ্য আমি নই, আমার গুরুদেবটি

ভাল হয়ে গেলে বাঁচি আমি! আপনারা সকলে সুচিকিৎসকও বটেন, সুহৃদও বটেন, আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম, যা ভাল বিবেচনা করেন করুন। টাকা খরচ করতে আমি পিছপাও হব না এইটুকু জানিয়ে দিয়েই আমি খালাস।

জগদীশবাবু বলিলেন—বেশ একটা দিন দেখা যাক। বিমলবাবু রক্তটাও পরীক্ষা ক'রে দেখুন!

ভূধরবাবু বলিলেন—আমি কিন্তু আগে মশাই এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়ে দেখতে চাই!

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—বেশ ত, দিন এক ফোঁটা, ক্ষতি কি!

নন্দী-মহাশয়ের গুরুদেবের ব্যবস্থা করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। বিমল হাসপাতালে ফিরিয়া দেখিল ভৈরবের স্ত্রী তাহার অপেক্ষায় তখনও বসিয়া রহিয়াছে। বিমল ছেলেটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—বেশ জ্বর আছে, কেমন যেন নিঝ্‌ঝুম হইয়া পড়িয়াছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও যেন কষ্ট। বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হইল, গলাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। ঠিকই ত, এই যে প্যাচ রহিয়াছে। ডিপথিরিয়া! গুপিবাবু দুই দিন পুরাদমে কুইনাইন মিকশচার দিয়া ছেলেটিকে আরও কাহিল করিয়া ফেলিয়াছেন!

—গুপিবাবু, ডিপথিরিয়া অ্যান্‌টিটক্‌সিন্ একটা দিন তো!

গুপিবাবু খানিকক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—ও ত আর নেই, সেবারে চৌধুরী মহাশয়ের নাতির অসুখে সব খরচ হয়ে গেছে!

বিমল স্তম্ভিত হইয়া গুপিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ-

কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। বলিল—এখানে দেখুন ত জগদীশবাবুর দোকানে—

জানকী বিমলের চিঠি হইয়া ছুটিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পাওয়া গেল না এখানে।

অর্থাৎ শিশুটি মরিবে!

ধনী চৌধুরী-মহাশয়কে খুশী করিবার জন্য বিমল হাসপাতালের এমন একটা মূল্যবান ঔষধ স্বচ্ছন্দে দান করিয়াছে এবং প্র্যাকটিসের তাড়ায় পুনরায় আনাইয়া রাখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

বিমল তখনই ঔষধের জন্য কলিকাতায় একটা টেলিগ্রাম করিল বটে, কিন্তু ইহাও মনে মনে বুঝিল যে ঔষধ আসিবার পূর্ব্বেই শিশুটি চলিয়া যাইবে।

গরীবদের জন্যই হাসপাতাল, কিন্তু গরীবদের সেখানে স্থান কোথায়? হাসপাতালের ভাল ভাল ঔষধ ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট রোগীদের জন্য খরচ হয় এবং তাহাদের অধিকাংশই ধনী। গরীবরা সেখানে দুই বেলা ভিড় করে এবং কাঙালী বিদায় করার মত তাহাদের রোজ বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, আর কিছু হয় না।

বিমলের কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল।

ভৈরবের স্ত্রী করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—ডাক্তারবাবু, ছেলে কি বাঁচবে না?

—শক্ত অসুখ করেছে, এখানে ত ওষুধ পাওয়া গেল না, তার ক'রে দিচ্ছি যদি কলকাতা থেকে এসে পড়ে তবে দিয়ে দেব।

ভৈরবের স্ত্রীর সমস্ত অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। তাহার ছেলের ওষুধের জন্য ডাক্তারবাবু নিজের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় তার করিতেছেন! মানুষ না দেবতা!

বিমল হাসপাতালে একা চুপচাপ বসিয়া ছিল।

সেই টিউমার-কেসটা জ্বরের ঘোরে ছটফট করিতেছে, খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। রীতিমত সেপটিক হইয়া গিয়াছে! বিমল ধীরে ধীরে তাহার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—বড় কষ্ট, বড় শীত।

—এখুনি কম হয়ে যাবে, জানকী আর একটা কম্বল আন তো—

জানকী আর একটা কম্বল আনিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সে চাবিটা লইয়া ঔষধের আলমারিটা খুলিয়া ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বাহির করিল। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গ্লাসে ঢালিয়া নির্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিল। আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই তাহাকে ব্র্যাণ্ডি খাইতে হইতেছে। হাসপাতালের বোতলটা ত ফুরাইয়া আসিল। আর এক বোতল আনাইয়া রাখিতে হইবে।

গঙ্গার ধারে গিয়া বিমল বসিয়া ছিল। নিজের স্বরূপ দেখিতে পাইয়া আজ হঠাৎ কেমন যেন সে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভৈরবের ছেলের মুখটা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া অসহায় পশুর মত মারা যাইবে! বিমল বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল, আর এক বার দেখিয়া আসা যাক। যদি দরকার হয় সে শ্বাসনালীতে ফুটা করিয়া তাহাকে আজ রাতটা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, কাল সকালে 'সিরাম' নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িবে। গিয়া দেখিল অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হইয়া আসিতেছে,

শ্বাসনালীতে ফুটা করিবার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই, নালী ঠিক আছে। তবু সে ভৈরবের স্ত্রীকে বলিয়া আসিল যে রাত্রে যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়ে তাহাকে যেন খবর দেওয়া হয়। অন্ধকারে একা একা গলির ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কানে গেল—আমাদের বিমল ডাক্তার ভৈরবের ছেলেকে নিয়ে তাহ'লে একেবারে হামলে পড়েছে বল! হরেন বোসের কণ্ঠস্বর। গুপিবাবুর কণ্ঠস্বরও শোনা গেল।

—হ্যাঁ, আজ নিজের পয়সা খরচ ক'রে কলকাতায় তার করলেন!

—ভাল, ভাল, মাগির কপাল ভাল!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—এমন জুতোমোজা-পরা শিক্ষিতা বউ ঘরে থাকতে এত নীচু নজর কেন ভদ্রলোকের! আমাদের দারোগাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা!

ইহার উত্তরে গুপিবাবু কি বলেন তাহা শুনিবার ধৈর্য্য আর বিমলের রহিল না। সে বারান্দায় উঠিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িল।

—গুপিবাবু, গুপিবাবু আছেন এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ত্রস্ত গুপিবাবু বাহির হইয়া আসিলে।

—আপনি তিন ডোজ্ ষ্টিমুল্যান্ট মিকশ্চার নিয়ে ভৈরবের বাড়ী যান, এক ঘণ্টা অন্তর তার ছেলেটাকে দেবেন, পাল্স্ রেসপিরেশন প্রতি ঘণ্টায় গুনে আমাকে খবর দেবেন।

গুপিবাবু নীরবে বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হরেন বোস বলিলেন—এটা ডাক্তারবাবু আপনার জুলুম করা হচ্ছে গুপিবাবুর উপর। উনি হাসপাতালের চাকর, আপনার ত চাকর নন।

—আপনি চুপ করে থাকুন।

তাহার পর গুপিবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনি যদি না যান, আপনাকে সাস্‌পেণ্ড করব আমি, আপনি সেদিন আমার প্রেসক্রুপশনে কুইনিন দেন নি, সে শিশিটা আমার কাছে আছে এখনও, সেটা নিয়ে যদি রিপোর্ট করি চাকরি থাকবে না আপনার।

গুপিবাবু বলিলেন—আজ্ঞে আমি যাচ্ছি এখুনি।

হরেনবাবুর দিকে একবার তাকাইয়া গুপিবাবু বাহির হইয়া গেলেন। গুপিবাবু চলিয়া গেলে বিমল হরেনবাবুকে বলিল—দেখুন আপনাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার সম্বন্ধে এ রকম আলোচনা যদি ভবিষ্যতে আপনি করেন, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আপনার।

হরেন বোস প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিমল চলিয়া গেল।

রাত্রে বিমল নিজের বাসার বাহিরের ঘরটায় বসিয়া নন্দী-মহাশয়ের গুরুঠাকুরের রক্তটা পরীক্ষা করিতেছিল। অনেক খুঁজিয়াও ম্যালেরিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, তবু সে খুঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার কানে গেল, দরাজ গলায় কে যেন বলিতেছে একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি, চৌষট্টি। মিহি গলায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—ও-কি, অতটা সরিয়ে সরিয়ে মাপলে চলবে কেন?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল প্রতাপবাবু ও রমেশবাবু।

প্রতাপবাবু একটি কাঠি দিয়া জমি মাপিতেছেন এবং রমেশবাবু লণ্ঠন ধরিয়া আছেন। প্রতাপবাবুর বাড়ী হইতে গঙ্গার ঘাট কত দূর ইহাই তর্কের বিষয় এবং হাতে কলমে তাহা তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বিমলের এই বৃদ্ধ দুইটির প্রতি সহসা কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা

হইল। কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না, নিজেদের লইয়াই মশগুল আছেন।

একটু পরে আসিয়া গুপিবাবু খবর দিলেন ভৈরবের ছেলেটি মারা গিয়াছে।

৯

সেদিন একটি চিঠি পাইয়া বিমলের ভারি ভাল লাগিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমির মধ্যে এই ছোটখাট ঘটনাগুলি ভারি একটা মাধুর্য্য সঞ্চার করে। চিঠিখানি লিখিয়াছেন শম্ভু কাকা! বিমলের রক্ত-সম্পর্কের খুল্লতাত নয়, সম্পর্কটা স্নেহের। শম্ভু কাকা জাতিতে গন্ধবণিক্। এই শম্ভুকাকাই বিমলের প্রথম শিক্ষক, ইঁহারই নিকট বিমল বর্ণপরিচয় আরম্ভ করে। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস, শম্ভু কাকা অর্থাভাব-প্রযুক্ত আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি উদ্যমশীল লোক, গ্রামের কয়েকটি ছেলে পড়াইয়া, ছোটখাট একটি দোকান করিয়া, সুদে টাকা খাটাইয়া কিছু অর্থ তিনি সংগ্রহ করিয়া পারিয়াছিলেন। তাহারই জোরে, নিজের অধ্যবসায়ের গুণে এবং বিমলের পিতার সাহায্যে তিনি জোগাড়যন্ত্র করিয়া কম্পাউণ্ডারিটা পাস করিয়া ফেলেন। কিছু দিন চাকরি করিয়াছিলেন, এখন চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বিমলদেরই গ্রামে প্র্যাকটিস করিতেছেন। বিমলের বাল্যকালে তিনি শম্ভু মাস্টার নামে পরিচিত ছিলেন, এখন সকলে তাঁহাকে শম্ভু ডাক্তার বলিয়াই জানে। বিমল বাল্যকালে তাঁহাকে শম্ভু কাকা বলিয়া ডাকিত। শম্ভু কাকার সহিত বহুকাল দেখা নাই, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বোধ হয় একবারও শম্ভু কাকার কথা তাহার মনে

পড়ে নাই। সেই শম্ভুকাকাই এত দিন পরে সহসা চিঠি লিখিয়াছেন।

প্রিয় বিমল,

অনেক দিন তোমার কুশল-সংবাদাদি পাই নাই। আশা করি সপরিবারে ভাল আছ। তুমি স্বর্গীয় সুরেনদাদার একমাত্র বংশধর, কৃতবিদ্য হইয়াছ এবং বংশের মুখজ্জ্বল করিয়াছ, ভগবানের নিকট প্রর্থনা করি দিন দিন তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তুমি অনেক দিন গ্রামে আস নাই, তোমার পৈত্রিক বাড়িটি মেরামতের-অভাবে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে। নিবারণদার মুখে শুনিলাম তুমি জমির বাকী খাজনা এবং সুরেনদার ঋণগুলি শোধ করিয়াছ। শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তোমার পৈত্রিক বাড়ীটি নিজব্যয়ে সারাইয়া তাহাতে আমি আমার ডিস্‌পেনসারি করি। বাড়ীটা গ্রামের মধ্যস্থলে, আমার সুবিধা হইবে। তুমি যে কখনো আসিয়া উহা সরাইয়া বসবাস করিবে তাহার আশা দেখি না। যদি অবশ্য কখনও তুমি আইস, আমি তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিব, একথা বলাই বাহুল্য। আমার হাতে একটি পুরাতন হাঁপানি রোগী আছে, কিছুতেই সারিতেছে না। তুমি যদি একবার এ অঞ্চলে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করিয়া দাও, বড়ই ভাল হয়। লোকটির অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কিছু কৃপণও বটে, পঞ্চাশ টাকার বেশী-দিতে পারিবে না। তাহাতে তোমার কথা বলিয়াছি, রাজি হইয়াছে। যদি আসিতে চাও, কবে আসিবে জানাইবে। আমি ষ্টেশনে হাজির থাকিব। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। গ্রামের অনেকেই তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক। যদি একবার এক দিনের জন্য আসিতে পার বড়ই আনন্দিত হই। আসিলে সন্ধ্যাতে সমস্ত

কথাবার্ত্তা হইবে। নিতান্তই যদি না আসিতে পার ঐ বাড়ীটি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি তাহা পত্রযোগে জানাইবে। ভগবানের চরণে সততই তোমার কুশল কামনা করি। ইতি— তোমার শম্ভু কাকা

বহুকাল পূর্ব্বে দেখা শম্ভু কাকার মুখখানি বিমলের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। এখনও কি তাঁহার তেমনি গোঁফদাড়ি আছে? মনে পড়িল বাল্যকালে ঐ গোঁফদাড়িসমন্বিত ব্যক্তিটি মনে বড়ই ত্রাস সঞ্চার করিত। বিমল তখনই শম্ভু কাকার পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। লিখিয়া দিল যে তিনি স্বচ্ছন্দে বাড়ীটি সারাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। তাহার এখন যাইবার সুবিধা নাই। সুবিধা পাইলেই সে গিয়া হাঁপানি রোগীটিকে দেখিয়া আসিবে। যাইবার পূর্ব্বে জানাইবেন।

—কাকে চিঠি লিখছ?

পিছনে মণিমালা আসিয়া দাঁড়াইল।

—শম্ভু কাকাকে।

কে তিনি?

—তুমি চেন না, আমাদের গ্রামের লোক। আমাদের বাড়ীটাকে নিজের খরচে সারিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারি করিতে চান। লিখে দিলাম তাই করিতে, কি বল?

—যা তোমার ইচ্ছে, আমি আর কি বলব?

—বাঃ তুমি হ'লে সহধর্ম্মিণী, তুমি বলবে না ত কে বলবে!

—আহা!

বিমল চিঠির ঠিকানাটা লিখিয়া উঠিয়া পড়িল।

—এই ত এলে, আবার যাচ্ছ কোথায়?

—নন্দী-মশায়ের ওখানে যেতে হবে, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আসছে, হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার।

—তুমি তাহলে একটু খেয়ে যাও

—কি ?

চোখমুখ রহস্যময় করিয়া ভুরু নাচাইয়া মণিমালা বলিল—একটা জিনিস করেছি আজ।

—কি ?

—পেয়ারার জেলি।

—ফের তুমি উনুন-গোড়ায় গেছ।

—আহা চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না কি! আর যা তোমার ঠাকুর!

মণিমালা বহির হইয়া গেল এবং একটা প্লেটে করিয়া খানিকটা পেয়ারার জেলি আনিয়া বলিল—দেখ কেমন সুন্দর রং হয়েছে।

—চমৎকার হয়েছে, বাঃ খেতে ও সুন্দর।

জেলিটুকু খাইতে খইতে বিমল পুনরায় বলিল—তুমি কিন্তু আর উনুন-গোড়ায় যেও না, ফের কি কাণ্ড ক'রে বসবে!

—ভাল লাগে না চুপ ক'রে ব'সে ব'সে।

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—একটা গ্রামোফোন কিনে দাও তাহলে বসে বসে বাজাই।

বিমল হাসিয়া বলিল—পাড়ার লোকে বিরক্ত হবে তাহলে।

মণি ঠোঁঠ উল্টাইয়া বলিল—ভারি বয়ে গেছে!

বিমল আর বেশীক্ষণ বসিল না, নন্দী-মহাশয়ের ওখানে এখনই যাওয়া দরকার। গুরুঠাকুরের জরটা ছাড়ে নাই।

নন্দ-মহাশয় একাই বসিয়া ছিলেন। বিমলকে দেখিয়া বলিল—কাল থেকে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি, ফাঁক আর পাচ্ছি না।

—কি বলুন ত ?

—ঘোষেদের ঐ যে হতভাগী মেয়েটা পুড়ে মোলো তা নিয়ে আবার কিছু গোলমাল হবে না ত মশাই, শুনেছেন ত সব ঘটনা—

শুনেছি। গোলমাল আর কি হবে, সে ত যা হবার চুকে বুকে গেছে।

—কিছু বলা যায় না, ত শত্রুর ত অভাব নেই!

তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চক্ষু দুইটি পাকাইয়া নন্দী-মহাশয় বলিলেন—একমাত্র পুত্র না হ'লে গুলি ক'রে মেরে ফেলতাম আমি ওকে। নচ্ছার কুলাঙ্গার কোথাকার!

বিমল বুঝিল রমেনের কথাটা নন্দী-মহাশয়ের কানে গিয়াছে। পুত্রের উপর খুবই চটিয়াছেন তিনি। কিন্তু ক্ষণপরেই বিমলের সে ধারণা অপনোদিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রমেন প্রবেশ করিল এবং নন্দী-মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বাবা রমেন, গুরুদেবের জন্যে কলকাতা থেকে ফলটা এল কি না ইষ্টিশানে একবার খোঁজ কর ত বাবা! গাড়ীটা নিয়েই না হয় যাও!

অতি মোলায়েম কণ্ঠস্বর, কিছুমাত্র উত্তাপ নাই।

রমেন চলিয়া গেলে নন্দী-মহাশয় বলিলেন—আমাদের ঘোষালবাবু খাসা লোক ছিলেন, জিনিষপত্র এলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। এ লোকটা জুটেছে অতি ব্যাদড়া! ঘোষালবাবু সম্প্রতি বদলি হইয়া গিয়াছেন।

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, নন্দী-মহাশয় আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া বলিলেন—ওরে হাওয়া কর।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—গুরুদেব কেমন আছেন?

—এ বেলা জ্বরটা যেন কিছু কম। তবে শ্লেষ্মা এখনও বেশ রয়েছে! কলকাতা থেকে ত উনি আসছেনই আজ রাত্রে, তার কি সব ব্যবস্থা

করতে হবে আপনারা তিন জনে ব'সে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে ফেলুন। কেসের হিষ্ট্রিয়া ভূধরবাবু টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ভূধরবাবু ইদিকে বেশ ইয়ে আছেন! ডাকতে পাঠিয়েছি সব, এলেন বলে।

ভূধরবাবু ও জগদীশবাবুর প্রত্যাশায় বিমল বসিয়া রহিল।

১০

চালতাপুর নামক একটি দূর গ্রামে বিমল রোগী দেখিতে গিয়াছিল। গ্রামটি বেশ দূর আছে। নদী পার হইয়া কিছু দূর মোটরে গিয়া তাহার পর হস্তিপৃষ্ঠে যাইতে হইয়াছিল। গ্রামটি নিতান্ত ছোট নয়। দুই তিন জন পাস-করা ডাক্তারই আছেন। রোগীর টাইফয়েড হইয়াছে, বিশেষ কিছু করিবার নাই, যাহা কর্তব্য তাহা ওখানকার ডাক্তাররাই করিতেছিলেন। কিছু করিবার থাকিলেও এত দূর হইতে গিয়া আধ ঘণ্টা বড়জোর ঘণ্টখানেক রোগীর নিকট বসিয়া তাহা করা যায় না। কিন্তু যেহেতু শ্রীমান্ ঢুলুর উক্ত গ্রামে মামার বাড়ী এবং যেহেতু উক্ত রোগীর বাড়ীর কর্তৃপক্ষ ঢুলুর মামাদের বাধ্য সেই হেতু বিমলকে যাইতে হইয়াছিল। বেশ মোটা টাকাই পাওয়া গিয়াছে। বিমল চালতাপুর হইতে মোটরযোগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিতেছিল, মথুরবাবুর বাড়ীতে পাঁচটার মধ্যে পৌছিতে হইবে। কলিকাতা হইতে আগত বিখ্যাত চিকিৎসকটি আসিবার ঘণ্টা দুই পরেই নন্দী মহাশয়ের গুরু-ঠাকুরের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার ডাক্তারের একদাগ মাত্র ঔষধ পেটে পড়িয়াছিল। রোগী সারাইতে হইলে ভাগ্য থাকা চাই। মথুরবাবুও কলিকাতার ডাক্তারবাবুকে আজ বৈকালে 'কল' দিয়াছেন,

তাঁহার কন্যা শেফালির মাঝে মাঝে হাঁপানির মত হইতেছে, তাহাকে দেখাইবেন। পাঁচটার সময় তাঁহার আসিবার কথা, বিমলকে তাহার মধ্যে পৌঁছিতে হইবে। বিমল হাত-ঘড়িটা এক বার দেখিল, পৌনে চারটে। পাঁচটার মধ্যে ঠিক পৌঁছিতে পারিবে, দশ মাইল যাইতে আর কতক্ষণ লাগিবে।

মোটরে বসিয়া বিমল চালতাপুরের ডাক্তার গাঙ্গুলীমহাশয়ের কথা ভাবিতে লাগিল। গাঙ্গুলী-মহাশয়ের কায়দাকরণ একেবারে অন্য প্রকার। অন্য ডাক্তার রোগী আসিলে খুশী হয়, গাঙ্গুলী-মহাশয় চটিয়া যান। সহজে দেখাই করিতে চান না, বেশী পীড়াপীড়ি করিলে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া যান। দেখিতেও প্রিয়দর্শন নহেন, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, রোগা চেহারা।

কেহ অসুখের কথা বলিলে বলেন—তোমার অসুখ হয়েছে তাতে আমার কি!

—একটু ওষুধ

—ওষুধ-ফষুদ আমার কাছে নেই, বিরক্ত ক'রো না।

লোকে তবু ছাড়ে না, ঐ কটুভাষী কুদর্শন লোকটির দ্বারে ধরণা দেয়। কাতারে কাতারে রোগী বসিয়া আছে, বিমল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাই বলিয়া গাঙ্গুলি-মহাশয় যে একেবারেই চিকিৎসা করেন না তাহা নয়। অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক পীড়াপীড়ির ফলে কটুকাটব্য করিতে করিতে দুই-চারিটি রোগী তিনি বেশ মোটা দক্ষিণা লইয়া তবে চিকিৎসা করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি স্পর্শই করেন না। লোকের তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস, বাড়ীর সামনে সর্ব্বদা ভিড়।

মথুরবাবুর বাড়ী পৌঁছিয়া বিমল দেখিল কেহ তখনও আসে নাই।

মথুরবাবু একা বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন। বিমল জিজ্ঞাসা করিল —অমর কই ?

—দুর্ভিক্ষ সমস্যা সমাধান ক'রে তিনি কলিকাতা গেছেন। এবার কোন খেলোয়াড়ের ফর্ম কি রকম, রেফারি চরিত্রবান্ লোক কি না, যে দল-জিতবে তার জেতবার ন্যায্য দাবী আছে কি না—এই সব নানা মূল্যবান্ খবর সংগ্রহ করতে সময় লাগবে ত কিছু দিন! ফিরতে দেরি আছে।

বিমল হাসিয়া একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে বিমলের দিকে চাহিয়া মথুরবাবু বলিলেন—বড়লোকের ছেলে, করবেই না বা কেন! এদেশে বড়লোকের ছেলেরা আগে বেড়ালের বিয়ে, বুলবুলির লড়াই, এই জিনিষ নিয়ে থাকত, ওই সবেই হাজারো হাজারো টাকা খরচ করত। আজকাল রুচিটা বদলেছে!

বিমল বলিল—শেফালির হাঁপানিটা কি বেড়েছে না কি আজকাল ?

—বাড়া-কমা ত কিছু বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে যখন হয় খুবই কষ্ট পায়। দেখি তোমাদের বড় ডাক্তার কি বলেন।

বিমল একটু হাসিল।

মথুরবাবু বলিলেন—হ্যাঁ আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তোমার নামে একটা দরখাস্ত গেছে কাল সিভিল-সার্জনের কাছে; আমিও তাতে সই করেছি। হরেন বোস এনেছিল দরখাস্তটা।

—কি লেখা ছিল তাতে ?

—সত্যি কথাই লেখা ছিল। লেখা ছিল যে তুমি আজকাল ক্রমাগত প্র্যাকটিস ক'রে বেড়াচ্ছ, হাসপাতাল মোটেই দেখছো না। গুপিই এখন হাসপাতালের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! গুপি

হাসপাতালে বসেই রীতিমত পয়সা নিতে আরম্ভ করেছে। সেদিন এপারেই একটি গরীব লোক বলছিল যে পয়সা না দিলে ঘায়ে লাগিয়ে দেয়। তুমিত অপারেশন ক'রে খালাস, ড্রেস করে ত ওই!

দু-জনে মিলে করে, গুপিবাবু আর দুলু।

—গুপিবাবুকে পয়সা না দিলে গুপিবাবু ঘায়ে খোঁচা দিয়ে ঘা আরও বাড়িয়ে দেন শুনেছি।

বিমল বলিল—বাজে কথা।

—না, না, একটুও বাজে কথা নয়। জগদীশবাবু নিজে আমাকে একথা বলেছেন! মোট কথা, আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে কি না! পঁচাত্তর টাকাতে একটা ভাল লোক থাকবে কি ক'রে। এই যে আমরা আমাদের আমলাদের কারো মাইনে পাঁচ টাকা, কারো দশ টাকা ক'রে দিই, তার মানে আমরা তাদের চুরি করতে বলি। আমি এবার আমলাদের মাইনে সব বাড়িয়ে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু সক্কলের তাতে আপত্তি, এমন কি তোমার বন্ধু অমরের পর্য্যন্ত। বলে, যা চলছে চলুক! বেশ চলুক, আমি আর ক'দিন আছি। দিন-পনর পরেই সরে পড়ছি এ-দেশ থেকে।

—কোথায় যাবেন?

—মথুরা

—মথুরা! হঠাৎ মথুরা কেন?

—আর এ-দেশ ভাল লাগে না। কাঁহাতক সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে 'বাথরুমে' ব'সে থাকি, বল! কারো সঙ্গে মতে মেলে না। এ-দেশে চিন্তায় আর কার্যে এত আকাশ-পাতাল তফাৎ যে কোন কিছুই হবার উপায় নেই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব সমান! বরং শিক্ষিতগুলো বেশী পাজি। সবাই জানে পণপ্রথা খারাপ তবু সবাই

পণ দিচ্ছে নিচ্ছে, সবাই জানে ঘুষ দেওয়া খারাপ, সবাই ঘুষ দিচ্ছে নিচ্ছে! কোন্ উচিত কার্য্যটা আমরা করি! একটাও না! এই যে তুমি একটা শিক্ষিত ডাক্তার পাঁচাত্তর টাকা মাইনেতে জুটে গেলে, তুমি কি জানতে না যে পঁচাত্তর টাকায় তোমার চলা অসম্ভব, তোমাকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করতে হবে এবং তা করলেই হাসপাতালে ক্ষতি হবে!

—কি করি বলুন, কিছু ত একটা করতে হবে।

—আরে এ-কথা ত একটা অশিক্ষিত কুলিও বলে! তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, বড় আদর্শের জন্যে তোমারই ত লড়বে, তোমরা যদি 'কিছু ত একটা করতে হ'বে' ব'লে অন্ত্যজের দলে ভিড়ে যাও তাহলে চলে কি করে!

বিমল বলিল—কটা লোক বড় আদর্শ অনুসারে চলতে পারে বলুন।

মথুরবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—বড় আদর্শের কথা ছেড়ে দাও, কোন আদর্শটা? মানি আমরা! জানালা খুলে শোওয়া খুব একটা বড় আদর্শ? যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা খুব একটা বড় আদর্শ? আসল কথা কি জান, আমাদের আদর্শ-ফাদর্শের বালাই নেই, আমরা সুবিধাবাদী, যখন যা সুবিধা তাই করি। ছেলেরা লেখাপড়া শেখে মানে কতকগুলো বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষার সময় সেগুলো উগ্‌রে দিয়ে আসে একটা ডিগ্রীর লোভে। চাকরী যদি পায় ভালই, না যদি পায় রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায়! শিক্ষিত হ'লে এ দুর্দ্দশা হত না।

বিমল বলিল—তাহলে এ-দেশে উপায় কি?

—উপায় বাথরুমে লুকিয়ে ব'সে থাকা, আর তা অসহ্য হয়ে উঠলে মথুরায় পালান।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

মথুরবাবু বলিলেন—মথুরাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম, মথুরাতেই দেহত্যাগ করব। আর ফিরছি না এ-দেশে!

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মথুরবাবু আবার বলিলেন—তোমর নামে কিন্তু খুব সঙীন দরখাস্ত গেছে কাল! তোমার সে পেটোয়া সিভিল-সার্জনও বদলি হয়ে গেছে এসেছে সায়েব, সুতরাং সাবধান!

বিমল হাসিয়া বলিল—যা হবার হবে, আমারও আর ভাল লাগছে না চাকরি!

মথুরবাবু হাসিয়া বলিলেন—চাকরী ছাড়া বড় সোজা কথা নয়। একবার যে ও-স্বাদ পেয়েছে তার পক্ষে ছাড়া কঠিন, অনেকটা আপিঙের নেশার মত। চাকরিতে অনেক কষ্ট, কিন্তু মাসের শেষে মাইনের করকরে টাকাগুলো হাত এলে সব কষ্টের অবসান হয়ে যায়। জননীর সন্তান-দর্শনের মত; ছেলের মুখটি দেখলেই দশ মাসের এত দুঃখকষ্ট আর কিছু মনে থাকে না।

মথুরবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। মথুরবাবু বলিলেন—ঐ বোধ হয় কলকাতার ডাক্তারবাবুকে নিয়ে জগদীশবাবু এলেন! চল, অভ্যর্থনা করা যাক।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার ডাক্তারবাবু বলিলেন আমি একটা ইনজেকশন লিখে দিচ্ছি, ওটা আনিয়ে ওকে অন্ততঃ দুটো কোর্স দেবেন, অর্থাৎ সবসুদ্ধ চব্বিশটা।

একটা কাগজে তিনি ইনজেকশনের নামটা লিখিয়া মথুরবাবুর হাতে দিলেন।

মথুরবাবু জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওটা আর আমি

নিয়ে কি করব, আপনি ওষুধটা পাঠিয়ে দেবেন, কিংবা আপনি একেবারে এনে ইনজেকশন স্বরুই ক'রে দিন কাল থেকে !

—কাল ত আমার অবসর নেই বোধ হয়, বিমলবাবুই না হয় এসে দিয়ে যাবেন !

—না, বিমলকে আমি ডাকি না, কারণ ও ফি নিতে চায় না।

—বেশ আপনি ইন্‌জেকশনটা পাঠিয়ে দিন, আমি না হয় ভূধরকে ডাকতে পাঠাব।

জগদীশবাবু এতক্ষণ ইনজেকশনটা কি তাহা পড়িয়া দেখেন নাই। পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পড়িয়া বলিলেন—এই ইনজেকশন তো আমার কাছে নেই।

কলিকাতার ডাক্তারবাবু তখন বলিলেন—এ কলকাতায় হয়ত পেতে পারেন, হয়ত বলছি এই জন্যে যে সেদিন এক জন পায় নি। বম্বেতে অবশ্য পাবেন ঠিক !

মথুরবাবু বললেন—এ ইনজেকশন কি খুব বেশী ব্যবহার করেন নি আপনি ? এত দুষ্প্রাপ্য যখন—

এরূপ প্রশ্নের জন্য ডাক্তারবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—মানে খুব নতুন বেরিয়েছে এটা, জার্ম্মেনীতে অবশ্য অনেকে—

মথুরবাবু বলিলেন—আপনি নিজে বেশী ব্যবহার করেন নি ?

—নিজে অবশ্য বেশী করি নি, তবে জিনিসটা ভাল !

মথুরবাবু জগদীশবাবুর হাত হইতে প্রেসক্রপশনখানি লইয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁহার প্রাপ্য দক্ষিণা দিয়া দিলেন। এক-আধ টাকা নয়, অনেকগুলি টাকা।

ডাক্তারবাবু তাঁহার ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন—ছ-টা বাহান্নতে ট্রেন বললেন বুঝি নন্দীমশায় ?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে ত এবার উঠতে হয়। আচ্ছা চলি তবে, নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ। আপনার মেয়ে কেমন থাকেন জানাবেন আমাকে।

মথুরবাবু ডাক্তারবাবুকে গাড়ীতে চড়াইয়া প্রায় তাঁহার সামনেই একটু ঘুরিয়া প্রেসক্রুপশনখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন! ডাক্তারবাবু দেখিতে পাইলেন কি না ভগবান্ জানেন। তিনি আবার গলা বাড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা নমস্কার!

মথুরবাবু স্মিতমুখে হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

বিমল বলিল—এ কি করলেন?

মথুরবাবু বলিলেন—আমার মেয়ের শরীর এক্সপেরিমেণ্ট করবার জায়গা নয়।

জগদীশবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে তাঁহার জিহ্বা সকৌতুকে উঁকি দিতে লাগিল।

১১

সুব্রতবাবুর অনুরোধ এড়ানো গেল না। ছুটি লইয়া কলিকাতা যাইতে হইল। সুপ্রিয়া সঙ্গে গেলেন, মণিমালাও ছাড়িল না। বিমল ব্যবস্থা করিয়াছিল যে দুই দিন সে থাকিবে না পরেশ-দা'র স্ত্রী রাত্রে আসিয়া শুইবেন, বাহিরের ঘরটায় ভুলুও আসিয়া শুইবে। এতৎসত্ত্বেও মণি বলিল, সে একা থাকিতে পারিবে না। তা ছাড়া বাবা-মাকে সে কত দিন দেখে নাই, মন কেমন করে না বুঝি! এখানে ঘরে একা একা বসিয়া বসিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, বিমল ত সমস্ত দিন মজা করিয়া

বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় মোটরে, নৌকায়, পাল্‌কিতে, হাতীতে! তাহার যে কি করিয়া দিন কাটে তাহা সে-ই জানে। এখানকার লাইব্রেরির সমস্ত বই তাহার পড়া, দুই-চারিখানা অপঠিত ছিল তাহাও সে পড়িয়া শেষ করিয়াছে। এমন হতভাগা লাইব্রেরি যে কিছুতেই নূতন বই আনাইবে না। না, সে কোন কথা শুনিবে না, সে যাইবে। ঠোঁট ফুলাইয়া যখন সে এই কথাগুলি বলিল তখন তাহা অগ্রাহ্য করা বিমলের পক্ষে শক্ত হইল। সুতরাং বাক্স-প্যাটরা গুছাইয়া মণিও সঙ্গ লইল। তোরঙ্গ এবং গহনার বাক্স এখানে রাখিয়া যাইবে কাহার ভরসায়! যা চোরের উপদ্রব। তাহার জিনিষপত্র সবই সে সঙ্গে লইল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সে মণিকে লইয়া শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উঠিল। সুব্রতবাবু এবং সুপ্রিয়া হোটেলে গেলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া মণির বাবা মা খুবই সুখী হইলেন। হঠাৎ আগমনের কারণ শুনিয়া মণির বাবা বলিলেন—বেশ, আমি খুব চেষ্টা করব। ভদ্রলোক ফার্স্ট ক্লাস যদি হন, হয়ে যাবে বোধ হয়। তোমার সঙ্গে ত চেনা আছে আমাদের কমিটির দু-চার জনের। তাঁদেরও গিয়ে ধর। এ-সব ছাড়া আর একটা সুপারিশ যদি জোগাড় করতে পার তা হ'লে ত নির্ঘাত হয়ে যায়।

তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম করিলেন।

বিমল বলিল—আমার সঙ্গে ঠিক চেনা নেই, তবে ওঁর ছেলের সঙ্গে পড়তাম। আচ্ছা দেখি চেষ্টা ক'রে—

বিমল চা জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সুব্রতবাবুর কপাল ভাল, বেশী বেগ পাইতে হইল না। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটিও ভাগ্যক্রমে বাড়ীতে ছিলেন এবং তিনি পুত্রের

অনুরোধে একটা সুপারিশ-পত্রও দিয়া দিলেন। (যোগাযোগ যখন ঘটে তখন এমনই ভাবেই ঘটিয়া যায়। সাধে মানুষ অদৃষ্টে বিশ্বাস করে)

কলিকাতায় গেলে সিনেমা-দেখা একটা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়ী, আলোয় আলোয় চতুর্দ্দিক যেন দিনের মত হইয়া রহিয়াছে! প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল যে অপূর্ব্ব শিল্পকলা চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলিবেন তাহার তুলনায় প্রবেশ-মূল্য কিছুই নয়। এমন একটা প্রাসাদের সুশীতল আবেষ্টনীতে অমন সুন্দর আরাম-জনক একখানা আসনে দুই ঘণ্টা নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পাওয়ারই কি মূল্য কম! বিমল, মণিমালা, সুব্রত ও সুপ্রিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঠিক একটু আগে গিয়া উপস্থিত হইল। বসিতে-না-বসিতে আলো নিবিয়া গেল, সাদা পরদা বিচিত্র হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর, রুদ্ধশ্বাসে সকলেই দেখিতেছে। একটি আসন খালি নাই, সমস্ত পরিপূর্ণ। সব বয়সের, সব অবস্থারই লোক রহিয়াছে। থাকিবে না কেন, না-থাকাটাই অস্বাভাবিক। যাহা স্বপ্ন তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ছায়া-লোকে মূর্ত্ত দেখিতে সকলে চায়। অপূর্ণ সাধ, অনুচ্চারিত আকাঙ্খা, অচরিতার্থ কামনার ক্ষোভে ক্ষুব্ধ মন অল্প ক্ষণের জন্যও এই মায়ালোকে বসিয়া সেই ছবি দেখে যাহা সে জীবনে পায় নাই, পাইবে না। ছবিতে দেখিয়াও তবু খানিকটা তৃপ্তি আছে। ছবি দেখিয়াই সে খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে চায়। খানিক্ষণের জন্য নিজকে ভুলিয়া থাকাটাই কি কম লাভ! চতুর্দ্দিকের নানা প্রলোভনে সকলেই অহরহ পীড়িত, চেতন ও অবচেতন মনের নানা অসম্ভব তাগিদে সকলেরই অন্তর পরিশ্রান্ত, দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর কদর্য্যতায় সকলেরই সমস্ত সত্তা যেন কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে বাহিরে শান্তি কোথাও নাই, শান্তির

আশা নাই, শান্তি অর্জ্জন করিবার মত মানসিক সম্পদও নাই। দুর্ব্বল বিলাস-লোলুপ আর্ত্ত নরনারীর দল তাহাদের ব্যর্থ জীবনযাত্রার ক্ষোভ দুঃখ জ্বালা দ্বন্দ্বের উপর খানিকক্ষণের জন্য ঐ সুরঞ্জিত পরদাখানা টাঙাইয়া ধরে, উহারই আড়ালে আত্মগোপন করিয়া খানিক ক্ষণের জন্যও নিজকে ভুলাইয়া রাখে। বিমলের দুখীরামকে মনে পড়িল, সে বেচারা তাড়ি খায়। উদ্দেশ্য একই, আত্মবিস্মৃতি। তাড়ি খাইয়া রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়াটা বর্ত্তমান সভ্য-জগতে অচল, তাই দুখীরাম ঘৃণ্য। সভ্য জগতে সিনেমার এখনও জাত মারা যায় না, তাই ফরসা কাপড়-জামা-পরা শিক্ষিত দুখীরামের দল এখানে আসিয়া রোজ ভিড় করে। আর্ট? কয় জন লোক আর্ট বোঝে? রসোত্তীর্ণ ভাল ছবিতে কই এত ভিড় হয় না ত? মদও ত পরিমিত মাত্রায় পান করিলে উপকার হয়! কিন্তু শরীরের উপকারের জন্যই কি দুখীরাম তাড়ি খায়? ও-সব কিছু নয়, আসল কথা নেশা। এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রলোভন-ময় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় নেশা না-হইলে কাহারও চলে না। মানুষ কোন রকমে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়, না হইলে অন্তরের হাহাকার শুনিতে শুনিতে সে পাগল হইয়া যাইবে। এই অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে যাহারা ঐ সকল ছায়া-ছবির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, তাহারা সকলেই অর্দ্ধ-উন্মাদ, যাহাতে একেবারে উন্মাদ না-হইয়া যায় তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বিমলের সহসা সেই ভিখারীটার কথা মনে পড়িল, তাহার মৃত দেহটার ছবি মুহূর্ত্তের জন্য মানসপটে ফুটিয়া উঠিল,—রক্তের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! সে কি কখনও সিনেমা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল? ঐ যে মোহিনী নায়িকাটি ক্ষণে ক্ষণে নানা ছুতায় নিজের দেহের মাধুরী অনাবৃত করিতেছে, তাহার খবর পাইবার সুযোগ তাহার হইয়াছিল কি? হয়ত হয় নাই, সুদূর মফস্বলে ভিক্ষা করিয়া এবং

রোগে ভুগিয়াই তাহার জীবনটা কাটিয়াছে। কলিকাতা শহরে থাকিলে হয়ত সে সুযোগ পাইলেও পাইতে পারিত। মাত্র কয় গণ্ডা পয়সা ত! হয়ত এই দলের মধ্যে ভিখারীও অনেক আছে···কে জানে!

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আহার করিবার সময় শাশুড়ীঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া বসিলেন। একথা-সেকথার পর বলিলেন—আমি মনে করছি বাবা, মণিকে না হয় রেখেই দিই এ ক-মাস! ছেলে-টেলে হ'লে একেবারে যাবে, কি বল?

বিমল বলিল—তার ত এখন অনেক দেরি।

—ছ-মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এটা প্রথম বার কি না তাই ভয়, এখানে কলকাতা শহরে সব রকম সুবিধা আছে। তোমাদের মফস্বল জায়গা, তুমি হয়ত বাড়ীতে থাকবে না—তার চেয়ে ও থাকুক এ ক-মাস!

বিমল কিছু না বলিয়া আহার করিতে লাগিল।

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী পুনরায় বলিলেন—ওর যে পা পুড়ে গেছল সে কথা ত আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাও নি কিছু তোমরা! ভাগ্যিস বেশী কিছু হয় নি। ঠাকুর না হ'লে কি চলে বাবা, ও কি পারে রাঁধতে, রান্নার জানেই বা কি।

একটা অপ্রিয় কথা বিমলের তুণ্ডাগ্রে আসিয়া থামিয়া গেল। সে নীরবেই আহার সমাধা করিল। শাশুড়ী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—তাহলে মণি থাক, কি বল?

—দেখি, মণিকে জিগ্যেস করি!

—ও ত থাকতে পেলে আর কিছু চায় না। তোমাদের ঐ মফস্বল জায়গায় না আছে সিনেমা, না আছে রেডিও, মেয়ে ত একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছেন

বিমল কিছু না বলিয়া একটু হাসিল।

সেদিন রাত্রে মণিমালাও বিমলকে ওই কথাই বলিল।

—মায়ের কাছে থাকি, কেমন ?

—বেশ।

—না, তুমি ভাল মুখে বল।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল বলিল—বেশ ত থাক না।

—রাগ করছ তুমি !

—রাগ করব কেন, থাক।

—মন কেমন করলে চলে যাব, কেমন ?

—বেশ।

পরদিন বিমল একাই ফিরিয়া আসিল। মণি, সুব্রত, সুপ্রিয়া কেহ আসিল না।

১২

দেখিতে দেখিতে আরও দুই মাস কাটিয়া গেল।

ডাক্তারের দৈনন্দিন জীবন যেমন ভাবে চলে তেমনি ভাবে চলিতে লাগিল। রোগী আসে যায়, বাঁচে, মরে। মাঝে মাঝে এক-আধটা রোগী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কেহ হয় ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁচিয়া যায়, কেহ অপ্রত্যাশিত ভাবে মরে, অপ্রত্যাশিত উপায়ে মাঝে মাঝে দুই-একটা রোগ-নির্ণয়ও হইয়া যায়। যাহাকে কালাজ্বর বলিয়া মনে হইতেছিল হঠাৎ দেখা যায় তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে, যে অসহ্য মাথা-ধরার যন্ত্রণায় চশমার পর চশমা বদলাইয়া, খাদ্য সংযম করিয়া, কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না, হঠাৎ রক্ত পরীক্ষা করিয়া জানা যায় পিতার পাপের শাস্তি সে ভোগ করিতেছে। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের

গোলমাল লইয়া বিকটাকার কোন রোগী হয়ত হাজির হয়, তাহাকে লইয়া খানিক ক্ষণ বেশ কাটে। এই ভাবেই চলিতেছিল। হরেন বোসের দল দরখাস্ত করিয়া বিমলের কিছু করিতে পারে নাই, কারণ সাহেব সিভিলসার্জন বিমলের নিকট সমস্ত সত্য কথা শুনিয়া কাগজে কলমে কিছু করিলেন না, মুখে বিমলকে আর একটু ট্যাক্‌ট্‌ফুল অর্থাৎ কৌশলী হইতে উপদেশ দিলেন, বলিলেন যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করিলে চলে না তাহা ঠিক, কিন্তু সব দিক বাঁচাইয়া তাহা করিতে হইবে। ইউ মাস্ট্‌ বি ট্যাক্‌ট্‌ফুল!

মথুরবাবু সত্য সত্যই সস্ত্রীক মথুরা চলিয়া গিয়াছেন। নন্দী-মশায় নিরঙ্কুশভাবে চেয়ারম্যানগিরি করিতেছেন। তাহার ইলেক্‌ট্রিক স্কীম সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। মথুরবাবু মিটিঙে ছিলেন না, সুতরাং একটি লোকও বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই। বদিবাবু সম্প্রতি একটি মন্দির-সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত আছেন। কোথায় একটা পাহাড়ের উপর না কি একটা মন্দির আছে, জৈনেরা সেটাকে নিজেদের মন্দির বলিয়া দাবী করিতেছে এবং হিন্দুদের সেখানে ঢুকিতে দিতেছে না। বদিবাবু হিন্দুদের পক্ষ লইয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজকাল তিনি এখানে নাই, বম্বেতে এই উপলক্ষেই গিয়াছেন! তাঁহার তিলমাত্র অবসর নাই। ইনসিউলিন লইয়া হীরালালবাবু অনেকটা সুস্থ আছেন, মতিলালবাবুর ইন্‌জেকশন এখনও চলিতেছে। সুব্রতবাবুর চাকুরি হইয়াছে এবং তিনি সুপ্রিয়াকে লইয়া কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন! সৌরীনবাবু ঠিক তেমনিই আছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার নিজের এলাকার সমস্ত গরুর পায়ে ঘুঙুর পরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। বলিতেছেন এটা ব্যাপকভাবে করিতে পারিলে গোধূলিটা সত্যই মনোরম হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে গোধূলিতে ধূলি ছাড়া আর কিছু নাই।

পরেশ-দা বদলি হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে যিনি আসিয়াছেন তিনি মুসলমান, বিমলের সহিত এখনও তেমন আলাপ হয় নাই। বিনোদিনীকে লইয়া অমর প্রকাশ্য দিবালোকেই এক দিন তাহার বাসায় আসিয়াছিল। অমর বিনোদিনীকে এখনও তাহার পাপের কথা বলিতে পারে নাই। এ-অঞ্চলে যাহাতে 'নাইট স্কুল' হয় তাহারই চেষ্টায় সে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিনোদিনীর সহিত বিমলও প্রকাশ্যভাবে নানা স্থানে আজকাল ঘুরিতেছে। মথুরবাবু নাই, সুতরাং পরদা ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া হরেন বোস গুপিবাবুর দলে কানাঘুসাও চলিতেছে। প্রতাপবাবু ডাক্তার এবং রমেশবাবু মোক্তার ভাঙা চৌকিতে বসিয়া এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই তর্ক করিয়া চলিয়াছেন। সেদিনই হাসপাতালে যাইতে যাইতে বিমল শুনিতে পাইল রমেশবাবু বলিতেছেন যে আজকাল যে এত অনাবৃষ্টি তাহার কারণ পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপবাবুর মত ভিন্ন প্রকার, তাঁহার মতে ইংরেজ রাজত্বই ইহার কারণ! উভয়ের তর্ক চলিতে লাগিল, বিমল সবটা শুনিতে পাইল না।

মণিমালা ভাল আছে, প্রায়ই চিঠি লেখে। প্রায়ই চিঠি লেখে বটে, চিঠিতে বিমলের জন্য উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করে, কিন্তু কেমন যেন মন ভরে না। বিমলের মনে হয় সে রেডিও, সিনেমা, ভাই-বোন, মা-বাবা শাড়ী-ব্লাউস এই সকল লইয়াই বেশী মাতিয়া আছে, লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্যই মাঝে মাঝে তাহাকে চিঠি লেখে। চিঠিতে নানা রকম কথা থাকে, কিন্তু কিসের যেন একটা অভাবও থাকে, ঠিক যে সেটা কি তাহা বিমল বুঝিতে পারে না। তাহার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় মণিমালা বোধ হয় তাহাকে পছন্দ করে নাই, তাহার স্বামীর আদর্শের অনুরূপ হয়ত সে নয়। সে ত প্রায়ই গল্প করিত তাহার কোন

বান্ধবী আই. সি. এস. কে বিবাহ করিয়াছে, কাহার খুব বড় জমিদারের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, এক জনের স্বামী নাকি ব্যারিস্টার, তাহাদের না কি তিন খানা মোটর, আর এক জনের নাকি কোন এক দালালের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে সে না কি 'অসম্ভব' বড়লোক। ইহাদের কাহারও সহিত বিমল পাল্লা দিতে পারে না, মানুষ হিসাবে সে হয়ত ইহাদের সমকক্ষ, কিন্তু মানুষটাকে মণিমালা চিনিয়াছে কি? বিমল ঠিক বুঝিতে পারে না। হয়ত এ-সব কিছুই নয়, সমস্তই তাহার কল্পনাপ্রবণ মনের সৃষ্টি, হয়ত মণিমালা সত্যই তাহাকে ভালবাসে!

আর একটা বিষয়েও বিমলের মনে অশান্তি ছিল। তাহার বিবেকের সহিত তাহার আচরণের কিছুতেই মিল হইতেছিল না। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের খরস্রোতে সে ভাসিয়া চলিয়াছিল, ইচ্ছা করিলেও সে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না, হাসপাতালের দীন দরিদ্র রোগীর দল গুপিবাবুর কবলেই পড়িতেছিল, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও বিমলের কিছু করিবার উপায় ছিল না। ডাক আসিলে যাইতেই হয়, অর্থের জন্য না হইলেও খাতিরে পড়িয়া যাইতে হয়। কাহাকে ফিরাইবে সে! দুই-চারি বার কনসালটেশনে আসিয়া সাহেব সিভিল-সার্জনের উগ্রতাও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। হরেন বোস তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও আর কিছু করিতে পারিবে না। হরেন বোস ইদানীং আর বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহেও না, বরং তাহার সহিত ভাব করিবার জন্যই ব্যগ্র! এমনি করিয়াই দিনের পর দিন কাটিতেছিল এবং আরও কিছু দিন হয়ত কাটিত কিন্তু সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সহসা এক দিন সকালে আয়নায় মুখ দেখিতে গিয়া বিমল লক্ষ্য করিল তাহার মুখময় লাল লাল চাকা চাকা কি যেন বাহির হইয়াছে। মতিবাবুর

সিংহের মত মুখখানা তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সে সভয়ে বিস্ফারিত চক্ষে আয়নাটার দিকে চাহিয়া রহিল।

১৩

অন্য কোথাও নয়, মুখে—সুতরাং খবরটা চাপা রহিল না। নানা ছুতায় অনেকেই আসিয়া বিমল ডাক্তারের সহিত আলাপ করিয়া গেল এবং খবরটা প্রত্যক্ষ করিয়া রং চড়াইয়া রাষ্ট্র করিতে লাগিল। হরেন বোস. বিমলকে কোন প্রকারে কায়দায় আনিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। এইবার কে কাহার পিঠের চামড়া তোলে দেখা যাক! হুঁ হুঁ বাবা, ভগবানের কাছে চালাকি নয়! লোকটা যে অতিশয় ইতর তাহা তিনি গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন কিন্তু একা কি করিবেন, সকলেই উহার পক্ষে। এমন কি চৌধুরী মহাশয়কেও পর্য্যন্ত ছোকরা হাত করিয়া ফেলিয়াছে। এইবার! আগুন এবং পাপ বেশীদিন চাপা দিয়া রাখা যায় না, এক দিন না এক দিন ফুটিয়া বাহির হইবেই। একেবারে মুখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। হইবে না? ভৈরবের স্ত্রীকে লইয়া যা ঢলাঢলি আজকাল আবার মথুরবাবুর পুত্রবধূটার সঙ্গে জুটিয়াছে! একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া মোটরে হাওয়া খাইতে যাওয়া হয়। মথুরবাবুর ছেলেটাও যেমন বখাটে, পুত্রবধূটাও কি ঠিক তেমনি জুটিয়াছে! শ্বশুর-শাশুড়ী যাইতে না যাইতেই দিগ্বিজয় সুরু করিয়া দিয়াছে! নমস্কার বাবা আজকালকার মেয়েদের চরণে! আমাদের বউ-ঝি মুখ্যু-সুখ্যু আছে, মুখ্যু-সুখ্যুই ভাল! —গুপিবাবুর সহিত এইরূপ নানা প্রকার আলোচনা করিয়া হরেন বোস দুইটি অস্ত্র চালনা করিলেন। প্রথম, সিভিল সার্জ্জনের কাছে আর

একটি দরখাস্ত দিলেন,কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে যেন অবিলম্বে হাসপাতাল হইতে অপসারিত করা হয়। দ্বিতীয় যে-কাজটি তিনি করিলেন তাহা তাঁহারই মত প্রতিভাবান্ লোকের পক্ষে সম্ভব। তিনি যে কবিতা লিখিতে পারেন তাহা কে জানিত। তিনি বিমল, ভৈরবের স্ত্রী, বিনোদিনী এবং কুষ্ঠ, এই চারিটি বিষয়কে জড়াইয়া একটি পয়ার রচনা করিলেন এবং সেটি অপরের দ্বারায় কার্বন কাগজ সহযোগে নকল করাইয়া এক দিন রাত্রে চতুর্দ্দিকে সাঁটিয়া দিলেন।

বিমলের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাহার চোখের সামনে যেন তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দাউ দাউ করিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, সে অসহায়ের মত বসিয়া দেখিতেছে। তাহার বারম্বার মনে হইতেছে আর কিছু নয়, পাপের শাস্তি। নিদারুণ অর্থগৃধ্নুতার নিদারুণ পরিণাম! হাসপাতালের গরীব অসহায় রোগীদের প্রাণ লইয়া সে যে এত দিন ছিনিমিনি খেলিয়াছে, চিকিৎসার নামে প্রতারণা করিয়াছে—এ তাহারই সাজা। সেই অসহায় ভিখারীটার কথা, ভৈরবের ছেলেটার কথা, যে টিউনার কেসটা সেপটিক হইয়া মারা গিয়াছিল তাহার কথা—সব তাহার মনে পড়িতে লাগিল! আরও যে কত মরিয়াছে তাহার ঠিক কি! গুপিবাবুর হাতেই ত সে আজকাল সকলের চিকিৎসার ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে ত নিজে কিছুই দেখিত না, দেখিবার অবসরই ছিল না। আরও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত তাহার অবসর ছিল না, এখন কিন্তু তাহার অনেক অবসর। কথাটা রাষ্ট্র হইয়া যাইবার পর হইতে তাহার ডাকও কমিয়া গিয়াছে। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে কে ডাকিবে! দুই দিন হইতে সে হাসপাতাল যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে! এই মুখ লইয়া সকলের সামনে বাহির হইতে কেমন যেন লজ্জা করে। তাহার কাছে আসিতেও সকলে কেমন সঙ্কুচিত হয়।

যোগেন চাকরটা পর্য্যন্ত কাল হইতে আসিতেছে না। ঠাকুরটা আগেই পলাইয়াছে। কেবল যায় নাই কাঙালী—সেই শূয়ারে-চেরা ছেলেটা। সে ভাল হইয়া গিয়াছে এবং বিমলের কাছেই আছে। আজ বিমল জগদীশবাবু ও ভূধরবাবুকে ডাকিয়াছে, তাঁহাদের মত এবং পরামর্শ লইবার জন্য।

জগদীশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—সারা মুখটাতেই বেরিয়েছে দেখছি যে, ছুঁলে বেশ বুঝতে পারেন ত, কোন অ্যানিস্‌থেসিয়া নেই?

—না।

—জ্বালাটালা করে?

—না।

জগদীশবাবু চশমাটি খুলিয়া বলিলেন—একবার কলকাতা গিয়ে দেখিয়ে আসুন মশায়!

—আপনার কি মনে হয়?

জগদীশবাবু হাসিলেন, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি বার-দুই উঁকি মারিয়া গেল। কিছুক্ষণ হাসিমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন—আপনি নিজে ডাক্তার, আপনাকে আর কি বলব আমি!

জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে ভূধরবাবু আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিমলকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বলিলেন—ও-সব একদম বাজে কথা। মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন আপনি! আপনি অত্যধিক মাংস-

টাংস খান, এই গরমে লিভার-টিভার খারাপ হয়ে কিছু হয়েছে একটা। একটা কোর্স ক্যালসিয়াম নিন আর ম্যাগসালফ খেয়ে ফেলুন খানিকটা—ও কিছু নয়, দু-দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিমল বলিল—তা না হয় যাবে, কিন্তু এখন যে সবাই একঘরে করেছে তার উপায় কি! কেস-টেস একেবারে আসছে না।

—কুছ পরোয়া নেই, আমি আপনাকে ব্যাক করব। আপনার বাহিরে যাবার দরকার নেই, ঘরে বসেই আপনার মাইক্রসকোপের কাজ করুন আপনি, আমি আপনাকে কেস পাঠাবো। ভয় কি!

—বামুনটা পর্য্যন্ত পালিয়েছে।

—তাই নাকি? আচ্ছা, আমার বাড়ী থেকে আপনার খাবার আসবে রোজ! কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না আপনি।

হরেন বোস আমার নামে আবার দরখাস্ত করিয়েছে তা শুনেছেন ত?

—শুনেছি। ও কিচ্ছু হবে না। আপনি সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে, এ যে লেপ্রসি নয় তা যে কোন ডাক্তার বুঝতে পারবে। আপনি হরেন বোসের নামে ডিফামেশন কেস ক'রে দিন একটা। ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া! ওই পত্রটা যে ওই লিখিছে তার প্রমাণ আমার হাতে আছে, যে-ছোকরা কপি করেছিল সে আমার চেনা লোক, তার কাছেই শুনলাম সব। দিন কেস্ ক'রে! প্রুফ আছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—ভারি দমে গেছি, কিছু ভাল লাগছে না।

—স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স জীবন যুদ্ধে দমে গেলে কি চলে মশাই, যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। ওই যে যেখানে ইটের ভাটা করেছি সেই জমিটার 'লিজ' নিয়ে নবীনবাবুর সঙ্গে কি কম ফাইটটা করতে হয়েছে আমাকে! শেষকালে মিথ্যে ছুটো ফৌজদারী

কেসই ক'রে দিলাম আমি ওর নামে, বাছাধন দেখলেন আমার সঙ্গে ট্যাঁ ফোঁ ক'রে বিশেষ সুবিধে হবে না, সুড়সুড় করে রাজি হয়ে গেলেন শেষকালে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবস্থা করতে হয়! এই যে দেখুন না, আগে মদ নইলে চলত না আমার, আজকাল আর খাই না। দেখলুম লিভার কিডনি-ফিডনিগুলো গোলমাল করছে, পয়সাও বেশ খরচ হচ্ছে, দিলাম ছেড়ে। যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। দমবেন কেন, কি হয়েছে আপনার? হবেন বোস? ওকে জব্দ করতে কতক্ষণ! দিন আপনি ওর নামে একটা কেস ক'রে, আর এবার চেষ্টা করুন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যেন এক পয়সার না কনট্রাক্ট পায়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা তো সবাই আপনার হাতে। কনট্রাক্ট না পেলে দেখবেন বাছাধন মুষড়ে যাবে।

বিমল কিছু বলিল না চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভূধরবাবু পকেট হইতে কাগজের ফর্দটা বাহির করিয়া বলিলেন—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এখনও পাঁচ জায়গাতে যেতে বাকী। ওঃ আর পারা যায় না! কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না আপনি। আমাদের বাড়ী থেকে ভাত পাঠিয়ে দেব আমি। আচ্ছা চলি এবার।

ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন।

বিপদে না পড়িলে লোক চেনা যায় না। ভূধরবাবুকে বিমল এত দিন চিনিতে পারে নাই।

সিভিল সার্জ্জন বিমলকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ঠিক কুষ্ঠ কিনা তাহা বলা শক্ত। মাস ছয়েক ছুটি লইয়া কিছু কাল অন্যত্র যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, ট্রপিক্যাল স্কুলেও একবার দেখাইয়া আসা উচিত। লেপ্রসি যদি হয় ছয় মাসের মধ্যে বোঝা যাইবে। সাহেব তাহার সহিত

যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিলেন। তাহাকে অবিলম্বে ছয় মাসের ছুটির জন্য সুপারিশ করিয়া একখানা সার্টিফিকেটও দিলেন।

ট্রপিক্যাল স্কুলে গিয়াও কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। তাঁহারা রক্ত লইয়া, চামড়া কাটিয়া, নাকের রস লইয়া নানা রকম পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। কুষ্ঠ যে নয় তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। একটা লাগাইবার ঔষধ দিয়া বলিলেন, আবার কিছু দিন পরে আসিতে। বিমল কলিকাতায় গিয়া গোপনে একটা হোটেলে উঠিয়াছিল, গোপনেই ফিরিয়া আসিল। এই চেহারা লইয়া মণির সহিত সে দেখা করিতে পারিল না। কাহারও সহিতই সে দেখা করিল না। কাহারও সহিত দেখা করিবার প্রবৃত্তিই তাহার ছিল না, এই জনতা হইতে দূরে যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। সে তাহার চাকরিস্থলেও আর ফিরিয়া গেল না। কলিকাতায় বসিয়াই সে ছুটির জন্য দরখাস্ত করিল এবং সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট-সুদ্ধ সেটি নন্দী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। ডুলুকেও একখানি চিঠি লিখিল সে যেন তাহার জিনিসপত্র তাহার দেশের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। সে সোজা দেশে ফিরিয়া যাইবে, এই ছয় মাস অন্য কোথাও নয়, শম্ভুকাকার আশ্রয়েই কাটাইয়া দিতে হইবে। দেশে গিয়া সে মণিকে জানাইয়া দিবে যে বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য তাহাকে ছুটি লইয়া দেশে আসিতে হইয়াছে, কিছুদিন দেশেই থাকিবে।

একটা জংসন স্টেশনে ট্রেন বদলি করিতে হইবে।

বিমল ট্রেনের প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মের একটা অন্ধকার অংশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আজকাল সে যথাসম্ভব আলোক পরিহার করিয়া চলিতেছে। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল প্ল্যাটফর্মের ওধারে যে মহিলাটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তিনি যেন অনেকটা বিনোদিনীর মত।

আশ্চর্য্য সাদৃশ্য তো! বিমল আর একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। এ কি, এ যে বিনোদিনীই। অমরও তাহা হইলে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। ভালই হইল ইহাদের সহিত দেখাটা হইয়া গেল।

বিমল আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—কোথা যাচ্ছেন আপনারা, অমর কই?

বিনোদিনী অবাক হইয়া গেল। বিমলকে এখানে দেখিবে সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিমল পুনরায় প্রশ্ন করিল—অমর কই, যাচ্ছেন কোথা!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী বলিল—আমি একাই যাচ্ছি।

—তাই নাকি, হঠাৎ একা কেন?

আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী একটা তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিল—এবার একাই চলতে হবে!

—মানে?

—মানে ত আপনি জানেন। আমি এত দিন জানতাম না, কাল জেনেছি। ও-কথা জানার পর আপনার বন্ধুর সঙ্গে থাকার আমার আর প্রবৃত্তি নেই।

বিমল নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

—কোথা যাচ্ছেন এখন?

—যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়ী।

—তার পর?

—তার পর কোথাও একটা চাকরি-টাকরি জুটিয়ে নেব।

বিনোদিনী এ-বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে চাহিল না, অন্য দিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। বিমলও কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরেই বিনোদিনীর গাড়ী আসিল, সে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ট্রেন চলিয়া গেল। বিমল বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল সে ভাবিতে লাগিল মণিও কি আমাকে এমনি করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবে যদি সে জানিতে পারে আমার কুষ্ঠ হইয়াছে? অমরের ব্যাধির কারণ কাম, আমার এটা যদি কুষ্ঠই হয় তাহা হইলে ইহার কারণ লোভ। তফাৎ তো খুব বেশী নয়! অসুখ হইলে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে! সহসা তাহার ভৈরবের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। সে চোর জানিয়াও তাহার স্বামীকে ত্যাগ করে নাই। তাহাকে গালি দিয়াছে, গঞ্জনা দিয়াছে, এমন কি মারিয়াছে পর্য্যন্ত, কিন্তু ত্যাগ তো করে নাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিমল তাহার আত্মজীবনী লিখিতেছিল—

এখানে এক বৎসর কাটিয়া গেল। সময় কত শীঘ্র কাটিয়া যায়! মনে হইতেছে এই তো সেদিন মাত্র আসিলাম। এই এক বৎসরে জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে, জীবনের নূতন স্বাদ পাইয়াছি। দুঃখের অন্ধকারে নিজের উপর নয়, ভগবানের উপর একান্তমনে নির্ভর করিয়াছিলাম। তাঁহার মঙ্গলময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখানে যে দিন প্রথম আসি সেদিন শম্ভুকাকা বাড়ীতে ছিলেন না, গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। আমার মনে শঙ্কা ছিল আমার চেহারা দেখিয়া শম্ভুকাকাও হয়ত ভয় পাইবেন, হয়ত তিনিও কোন ছুতায়

আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন। তখন শম্ভুকাকাকে চিনিতাম না। শম্ভু-কাকা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে অকপটে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম, কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত শুনিয়া তিনি আমার দিকে এমন করিয়া চাহিয়া রহিলেন যেন তিনি একটা দেবতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বলিলাম—শম্ভুকাকা, আপনিও ত্যাগ করবেন না তো?

—ত্যাগ করব! এ-ধারণা তোমার মাথায় কি ক'রে ঢুকল! নিজের সন্তানকে কেউ কখনও ত্যাগ করে?

তাহার পর সহসা তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—ত্যাগ করব! তোমাকে পূজো করা উচিত! একটা কুষ্ঠ-রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে জেনে-শুনে তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করেছ। আহত সৈনিককে কেউ কখনও ত্যাগ করে? বলছ কি তুমি!

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কোন ভয় নেই তোমার! তুমি চুপচাপ ব'সে থাক, আমিই তোমার চিকিৎসা করব! আজকাল এর তো খুব ভাল ইনজেকশন বেরিয়েছে। আজই আনতে দাও—ভয় কি, ঠিক হয়ে যাবে সব। আমিই তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি, দেখ না! সব ঠিক হয়ে যাবে।

শম্ভুকাকা এমন একটা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন যেন সমস্ত সমস্যার তিনি সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন! এ-রোগের যখন ইনজেকশন করিবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন আর ভাবনা কি! শম্ভুকাকার ইনজেকশনের উপর অগাধ বিশ্বাস। শুধু ইনজেকশন নয় সমস্ত জিনিসেরই উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। প্রত্যেক ঔষধটির যে-সকল গুণাবলী ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে শম্ভুকাকা সমস্ত বিশ্বাস করেন। মেটিরিয়া মেডিকা তাঁহার কণ্ঠস্থ এবং তাহাতে যে-সকল কথা লেখা আছে তাহা তিনি

অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মনে করেন। যদি কোন ঔষধের মনোমত ফল না হয় তিনি ঔষধের দোষ দেন না, নিজের বুদ্ধির দোষ দেন। তাঁহার ধারণা ঠিকমত বাছিয়া ঠিক ঔষধটি দিতে পারিলে নিশ্চয়ই রোগ সারিবে — সারিতে বাধ্য। শম্ভুকাকার এই বিশ্বাস দেখিয়া হিংসা হয়! আমাদের এ বিশ্বাস নাই। আমরা ঔষধ দিই দ্বিধাভরে; যদি ফল হয় ভালই, না যদি হয় কি করিব! শম্ভুকাকা ঔষধ দেন নিষ্ঠাভরে, যেরূপ নিষ্ঠাভরে ভক্ত দেবতার সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করে। শম্ভু-কাকার নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হই। শম্ভুকাকার চিকিৎসা-প্রণালীও অদ্ভুত। তিনি কেবল ঔষধ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, শক্ত রোগী হইলে তাহার সেবার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। শক্ত রোগী হইলে এবং পয়সা খরচ করিতে সক্ষম হইলে শম্ভুকাকা সাধারণতঃ ফুরণ করিয়া চিকিৎসা করেন। অর্দ্ধেক টাকা প্রথমে দিতে হয় এবং বাকী অর্দ্ধেক রোগ ভাল হইলে দিতে হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি থাকে। শম্ভুকাকা ঔষধের বাক্সটি লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসেন। নিজ হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়ান, পথ্যও নিজ হাতে প্রস্তুত করেন এবং নিজেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি সেবা করেন। রোগী যদি ভাল হয় তাহা হইলে শম্ভুকাকা সানন্দে তাঁহার বাকী অর্দ্ধেক টাকা লইয়া ফিরিয়া আসেন। রোগী মরিয়া গেলে তাহার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বসিয়া শোক করেন, শশ্মানে যান, তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রোগীর জন্য এতটা করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। শম্ভুকাকার ডাক্তারি বিদ্যা হয়ত তেমন গভীর নয়, কিন্তু বিদ্যার গভীরতা লইয়া কি হইবে যদি প্রাণ না থাকে! আমি যদি কখনও শক্ত অসুখে পড়ি, শম্ভুকাকার চিকিৎসাতেই থাকিব। আমার কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসাও হয়ত তাঁহাকে দিয়াই করাইতাম কিন্তু তাহার

প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার কুষ্ঠ হয় নাই, হইয়াছিল ডারমাল্ লিশ্ম্যানিয়াসিস! যে জীবাণু কালাজ্বর রোগের কারণ, সেই জীবাণুই ইহারও কারণ। মানুষের ত্বক আশ্রয় করিয়া অনেক সময় ইহা বিভীষিকার সৃষ্টি করে। আমার বিভীষিকাটা বেশী হইয়াছিল কারণ আমার বিবেকও সুস্থ ছিল না। নিজে অসুখে পড়িয়া একটা জিনিষ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি—আমাদের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যা অতিশয় অল্প। (এই অল্প বিদ্যার সহিত যদি সহৃদয়তা না থাকে তবে ইহা লইয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা জুয়াচুরির নামান্তর মাত্র)

বর্ত্তমানে আমার সমস্যা রোগ কিংবা রোগী নহে, বস্তুত কোন উৎকণ্ঠাজনক সমস্যাই আর আমার নাই, জীবনকে সহজ করিয়া ফেলিয়াছি। পৈতৃক জমি সামান্য যাহা ছিল তাহাই চাষ করিয়া দিন কাটাইতেছি। বিলাসের উপকরণ জুটাইতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু সুখে আছি। উন্মুক্ত বাতাসে, উদার মাঠে খোলা আকাশের নীচে স্বচ্ছন্দ সুন্দর গতিতে জীবন বহিয়া চলিয়াছে। (সিনেমা, রেডিও অথবা বৈদ্যুতিক আলোর অভাবে মোটেই কষ্ট পাইতেছি না। প্রকৃতির বিরাট নাট্যশালায় বহু সিনেমা, বহু আলো, বহু রেডিও আছে—দেখিবার চোখ এবং শুনিবার কান থাকিলেই তাহাদের পরিচয় মেলে। বিরাট্ আকাশ কখনও ঘনঘটাচ্ছন্ন, কখনও জ্যোৎস্নাকুল, কখনও রৌদ্রতপ্ত, কখনও মেঘ-বিচিত্র, কখনও নক্ষত্রখচিত। উদার মাঠ কখনও শ্যামল শোভায় হাসিতেছে, কখনও স্বর্ণবর্ণ পক্কশস্যভারে মহিমময় হইয়া উঠিতেছে, কখনও ধূসর উষর মূর্ত্তি। নদীর জলে ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, পাখীর গানে ক্ষণে ক্ষণে কত সুর—সমস্ত প্রকৃতির কত রূপ, কত ঐশ্বর্য্য।) আমরাও প্রকৃতির সন্তান, কিন্তু ইহাদের সহিত সহজভাবে কণ্ঠ মিলাইয়া জীবনের স্বাভাবিক ঐক্যসঙ্গীতে

যোগদান করিতে পারি না। আমরা কেমন যেন অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি। স্বল্প জ্ঞানের অহমিকায় জীবনকে অকারণে জটিল করিয়া সভ্যতার গর্ব্ব করিতেছি। আমার এই যে বর্ত্তমান জীবন ইহাও যে কম জটিল তাহা নহে, ইহাতে জটিলতা আছে। কিন্তু তাহা স্বাভাবিক জটিলতা, জটিলতার মধ্যেও খানিকটা সরলতা আছে। অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি বিচলিত করে, উইপোকা, শূকর অথবা সজারুর দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া পড়ি, দারুণ বর্ষায় অথবা দারুণ রৌদ্রে ঘরের মধ্যে আরাম করিয়া বসিয়া থাকা চলে না—মাঠে যাইতে হয়, জনমজুররা সকলেই শান্তশিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণ নহে, তাহারাও মাঝে মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এ সব জিনিস জীবনের মূল শান্তিকে বিঘ্নিত করে না—মানুষকে ভণ্ড করে না—বিবেককে বিষাক্ত করিয়া মুমূর্ষু করিয়া তোলে না। এসব জটিলতার মধ্যে কুচক্রীর কৌশল অথবা কুটিলতা নাই, এসব জটিলতা জীবনের সহজ জটিলতা, সুস্থ সবল জীবনী-শক্তির দ্বারা ইহাদের দমন করাও অসম্ভব নহে।

চাষ করি বলিয়া যে চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা নয়, চিকিৎসাও করি, কিন্তু চিকিৎসা লইয়া ব্যবসা আর করি না। (কোন বিদ্যা লইয়া ব্যবসা করা চলে না। বিদ্যায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ব্যবসায়ী হইলে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না।) বর্ত্তমান সভ্যতায় বিদ্যা-ব্যবসায়ী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের এত প্রভাব বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। বিদ্যা সমস্ত জীবন ধরিয়া অনুশীলন করিতে হয় এবং তাহার শেষ নাই—ইহা লইয়া ব্যবসায় চলিবে কিরূপে? সম্পূর্ণ জিনিষটা তো আমি কখনই ক্রেতাকে দিতে পারিব না, অথচ ভাণ করিতে হইবে যে সম্পূর্ণটাই দিতেছি। শব্দের ঝঙ্কারে ভাণ্ডের শূন্যতাকে ঢাকিতে হইবে! অনেক দিন উহা করিয়াছি, আর ভাল লাগিতেছে না। বলা বাহুল্য বড়লোকেরা আমাকে

ডাকে না। কারণ বড়লোকেরা ডাক্তার ডাকে ঠিক সেই মনোবৃত্তি লইয়া যে-মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা মোটর কেনে, বাড়ী করে। মোটর এবং বাড়ী যেমন পছন্দসই হওয়া দরকার, ডাক্তার, তেমনি পছন্দসই হওয়া চাই। শুধু চিকিৎসা করিলেই চলিবে না, বাড়ীর লোকেদের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নানা ডাক্তার নানা কৌশলে ইহা করিয়া থাকে। জগদীশবাবু, ভূধববাবু, গাঙ্গুলী মহাশয়, মহাদেববাবু সকলেই ইহা করিতেছেন, প্রত্যেকের ধরণটা শুধু আলাদা রকমের। আজকাল ডাক্তারির মত গুরুগিরিও একটা পেশা হইয়াছে এবং গুরুরাও শিষ্যদের মনোরঞ্জন করিয়াই নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখিতেছেন—প্রত্যেক ব্যবসায়েই ক্রেতার মনোরঞ্জন না করিলে চলে না।

যাহারা পয়সা দিয়া ডাকে তাহাদের চিকিৎসা করার আর একটা মুশকিল তাহারা রোগ না সারিলে ডাক্তারকেই দায়ী করে। তাহারা পয়সাটাকেই মানে এবং অর্থের বিনিময়ে সব কিছুই সম্ভবপর বলিয়া মনে করে। মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য্য পরিণাম তাহা তাহারা জানে হয়ত, কিন্তু মানে না। তাহারা মনে করে কিছু অর্থব্যয় করিলে বুঝি নিয়তিরও হাত এড়াইতে পারিবে এবং ডাক্তার তাহা এড়াইতে সাহায্য করে, সেই জন্যই তাকে পয়সা দেওয়া, সে যদি ঠিক্ মত তাহা করিতে না পারে তাহা হইলে সে আবার কিসের ডাক্তার!

গরীবেরা অসুখে পড়িলে ডাক্তারকে ডাকে, ভগবানকেও ডাকে। ঝড়ে বাড়ী উড়িয়া গেলে তাহারা দড়ি, খুঁটি চাল অথবা ঘরামিকেই পুরাপুরি দায়ী করে না, ঝড়কে এবং ঝড়ের প্রাবল্যকেও স্বীকার করে। তাহারা প্রকৃতির সহিত পরিচিত, প্রকৃতির রুদ্র, মোহন, শান্ত নানা রূপের সহিত তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, তাহারা নিয়তিকে মানে, ভগবানে

বিশ্বাস করে। এই সব অশিক্ষিত গরীব লোকদের চিকিৎসা করিয়া সুখ আছে, তাহাদের চিকিৎসা করিলেই তাহারা খুশী, বাঁচা-মরা ভগবানের হাত। ডাক্তর বাবু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, পরমায়ু ছিল না তাই মরিয়া গেল. থাকিলে নিশ্চয়ই বাঁচিত। অর্দ্ধশিক্ষিত সভ্য-নামধেয় জীবদের এমন সরল বিশ্বাস নাই, বিশেষ করিয়া যাহারা ধনী তাহাদের নাস্তিকতা আরও প্রখর। তাহারা মুখে, কাগজে-কলমে, বক্তৃতায় ভগবানের অস্তিত্ব হয়ত স্বীকার করে কিন্তু মনে মনে সকলেই নাস্তিক। নাস্তিক বলিয়াই এত অশান্তি। এই দীনদরিদ্র পল্লীবাসীরা অশিক্ষিত, অধিকাংশ লোকেরই অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। তবু কিন্তু তাহাদের জীবনের একটা আদর্শ আছে, দার্শনিকের মত একটা দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলিবার মত বলিষ্ঠতা আছে। ইহারা মূর্খ কিন্তু অমানুষ নয়। ইহারা জীবনকে পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া নয় জীবনের ভিতরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জীবনের সহিত সত্য পরিচয় আছে বলিয়াই ইহারা জীবন্ত।

ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া সত্যই সুখী হইয়াছি। ইহারা আমাকে টাকা দিতে পারে না বটে, কিন্তু যাহা দেয় তাহা অমূল্য—সমস্ত প্রাণটাই হাতে তুলিয়া দেয়! তাছাড়া গাছের ফল, ঘরের দুধ, উৎসবের মিষ্টান্ন, —যখন যেটুকু পারে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আনিয়া দেয়। সর্ব্বদাই যেন কৃতজ্ঞতায় অবনমিত হইয়া আছে, অথচ আমি ইহাদের কতটুকু করি, কতটুকু করিবার সাধ্য আছে আমার! অধিকাংশ অসুখেরই তো ঔষধ জানা নাই। তবে এটা ঠিক, ইহাদের অসুখ সহজে সারে, ইহারা অসহায় বলিয়া প্রকৃতিও করুণা করেন। আরও একটা কথা, বড়-লোকদের মত ইহাদের অসুখ অর্থ-জনিত নহে। ইহারা সাদাসিধা সোজা অসুখেই ভোগে এবং অল্প-স্বল্প চিকিৎসাতেই সারিয়া ওঠে। কুইনিন,

টিঞ্চার আওডিন, ম্যাগসাল্‌ফ এবং ক্যাষ্টর অয়েল দিয়াই শতকরা পঞ্চাশ জনের অসুখ সারিয়া যায়। অথচ এই সব অসুখই বড়লোকের বাড়ীতে হইলে কি কাণ্ডটাই না হয়! বড়লোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছি! মনে পড়িতেছে, প্রথম যখন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে যাই তখন অনাদিবাবু অনিলের স্যুটটা আমাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এত দিন যেন সেই স্যুটটাই পরিয়া অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলাম! ঢিলা জামা, ছোট প্যাণ্টালুন এবং আঁট জুতা পরিয়া কিছুতেই যেন শান্তি পাইতেছিলাম না। ধার-করা সেই স্যুটটা খুলিয়া ফেলিয়া যেন বাঁচিয়াছি।

পদশব্দ শুনিয়া বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পরেশ-দা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন!

—পরেশ-দা, হঠাৎ যে!

—বেড়াতে এলাম, ছুটিতে আছি এখন!

—বাঃ, বেশ হয়েছে—বসুন!

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার অসুখ-টসুখ ত সব বাজে তুমি আবার জয়েন করছ কবে?

—আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। জয়েন করব না।

—সে কি!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বদিবাবু মারা গেছেন জান ত?

—তাই নাকি! কি হয়েছিল?

—তিনি গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে সেই জৈনদের মন্দিরে তালা ভাঙবার

জন্যে পাহাড়ে উঠেছিলেন এক দল ভলন্টিয়ার নিয়ে, উঠতে উঠতেই হার্ট ফেল ক'রে মারা যান ! বড় ভাল লোক ছিলেন !

বিমল নীরব হইয়া রহিল, বদিবাবুর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তাহার মনের ভিতর জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

পরেশ-দা আর একটা খবর দিলেন।

তোমার সেই সুপ্রিয়া সরকার আর সুব্রতবাবুকে দেখলাম সেদিন। সুপ্রিয়া সরকারের হাতে এখন আর ইংরেজী নভেল নেই, কোলে খোকা ! প্যালপিটেশন্ সেরে গেছে শুনলাম। সুব্রতবাবুরও চেহারা ফিরে গেছে।

বিমল শুনিয়া একটু হাসিল।

—অমরের কোন খবর জানেন ?

—জানি। ভয়ানক মাতাল আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। জমিদারি ত দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে শুনেছি।

—তার স্ত্রী আর ফেরে নি ?

—না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরেশ-দা বলিলেন—তুমি আর জয়েন করবে না, মানে ? এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে ? এখানে প্র্যাকটিস সুরু করেছ বুঝি !

বিমল মৃদু হাসিয়া বলিল—করি কিছু কিছু।

—এখানে কি ওখানকার মত হবে ? ওখানে ফিলড্ কত বড় !

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার মণিমালার কি এ জায়গা পছন্দ হবে —এ যে ঘোর পাড়া-গাঁ—

বিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—আপনি শোনেন নি বুঝি ?

—কি ?

মণি মারা গেছে !

—সে কি, কি ক'রে ?

—ছেলে হতে গিয়ে !

পরেশ-দা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিমল হাসিয়া বলিল—যেদিন খবরটা পেলাম, সেদিনই ঠিক এখানে একটা খুব শক্ত লেবার-কেস করলাম আমি, গরীব চাষার মেয়ে, বেঁচে গেল সে !

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি নিজের কাছে রাখলেই পারতে ?

বিমল একটু হাসিল।

সমাপ্ত